দাম ঃ ৬.০০ টাকা

স্বস্তিকা

১৩ এপ্রিল - ২০০৯ ● নববর্ষ সংখ্যা - ১৪১৬

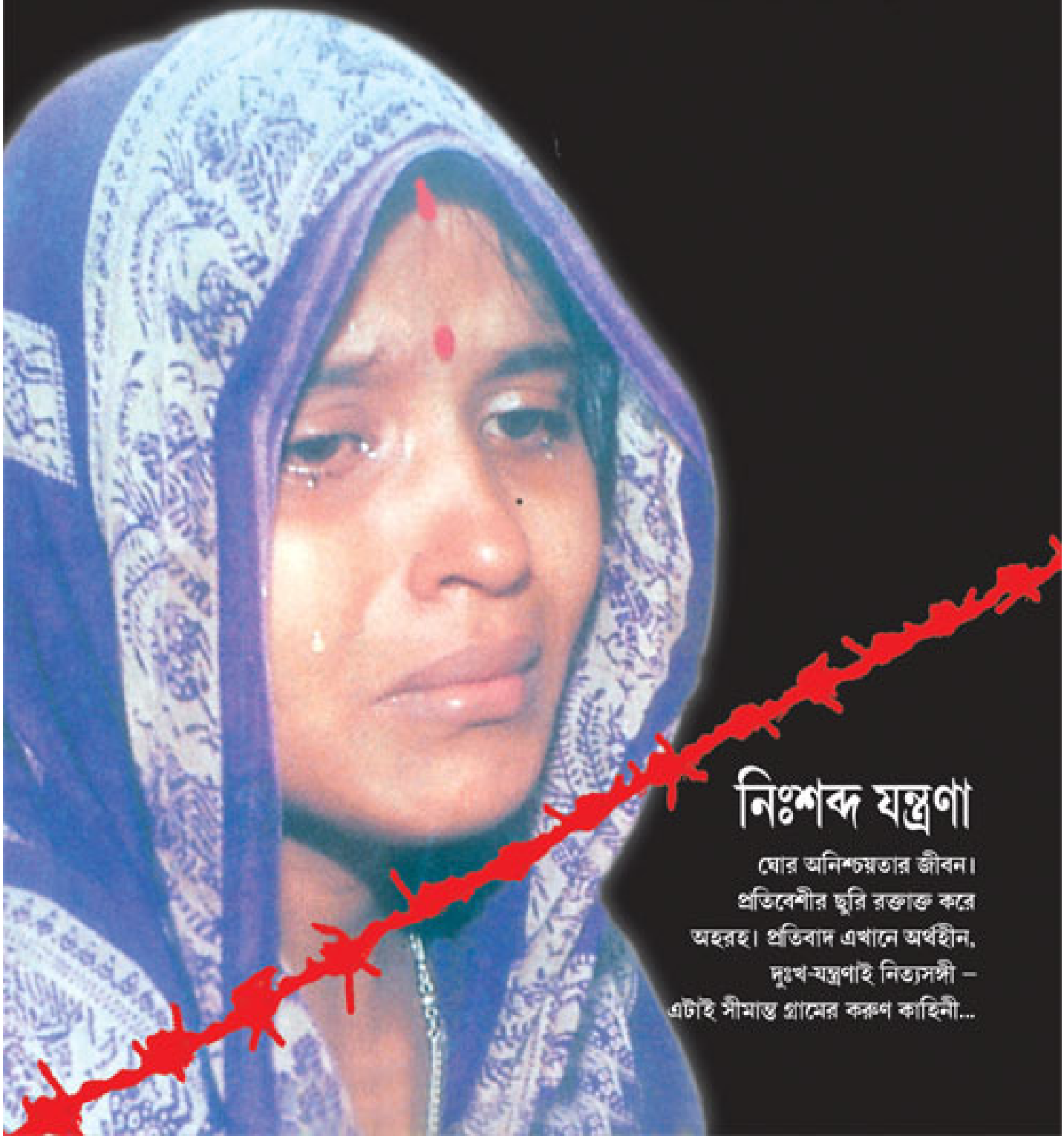

নিঃশব্দ যন্ত্রণা

ঘোর অনিশ্চয়তার জীবন।
প্রতিবেশীর ছুরি রক্তাক্ত করে
অহরহ। প্রতিবাদ এখানে অর্থহীন,
দুঃখ-যন্ত্রণাই নিত্যসঙ্গী –
এটাই সীমান্ত গ্রামের করুণ কাহিনী...

সূচিপত্র

নববর্ষের নবভাবনা

❑ স্বামী বেদানন্দ ❑ ৪

অনুপ্রবেশ ঃ জাতির নিরাপত্তা ধবংসের মুখে রাজ্য সরকার নির্বিকার

❑ বাণীপদ সাহা ❑ ৬

মসজিদ-মাদ্রাসা দিন দিন বাড়ছে

❑ প্রাণ প্রতিম পাল ❑ ৯

সীমান্তের সমস্যা ঃ ছিটমহল

❑ মনমোহন রায় ❑ ১১

সীমান্তের স্পর্শকাতর গ্রামগুলিই চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য

❑ উদয় সরকার ❑ ১২

ভেঙে পড়ছে জনসংখ্যার ভারসাম্য

❑ তরুণ কুমার পণ্ডিত ❑ ১৬

চোরাঘাটগুলিই পাচারের কেন্দ্র

❑ সন্তোষ সরকার ❑ ১৯

পরিকল্পনা মাফিক গ্রামগুলি হিন্দুশূন্য করা হচ্ছে

❑ রবিকিঙ্কর ঘোষ ❑ ২১

বনগাঁ সীমান্তের কড়চা

❑ সত্যানন্দ গুহ ❑ ২৪

বিয়ে করে ভোটার

❑ যতীন সমাদ্দার ❑ ২৬

সুন্দরবনই প্রবেশদ্বার, ঢোলা গ্রাম নিরাপদ আশ্রয়

❑ বরুণ শঙ্কর ঠাকুর ❑ ২৭

খোদ আগরতলাই বাংলাদেশীদের
দৌরাত্ম্যের কবলে

❑ প্রবীর কুমার চক্রবর্তী ❑ ৩০

সীমান্তের সন্ত্রাস ও আর এস এস

❑ রমাপদ পাল ❑ ৩২

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ ঃ অজিত ভকত

।। দাম ৬ টাকা ।।

Registered No.-SSRM/Kol.RMS/W.B/RNP-048/2007-09

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. - SSRM-KOL.RMS/RNP-048/LPWP-021/2007-09 ● R N I No. 5257/57

দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫,

টেলিফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@bsnl.in

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৬ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদক।। বিজয় আঢ্য

সহযোগী ।। বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

স্বস্তিকা

৬১ বর্ষ ৩২ সংখ্যা,
৩০ চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১১
১৩ এপ্রিল, ২০০৯

সম্পাদকীয়

সীমান্তের সমস্যা

রাত হয়
আঁজলা ভরা ধেনো বিষ দেহের ভেতর ভরে নিয়ে
বর্ডার পেরিয়ে আসে যে মানুষগুলো
তাদের পায়ের শব্দ চিনি, কিন্তু তাদের তো চিনি না
কেন তাদের চৌকাঠ ডিঙোতে দেব?

প্রবৃত্তিকে সংস্কৃতিতে রূপান্তর — সভ্য সমাজের একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আর এই বিশ্বে রূপান্তর বা পরিবর্তনের প্রয়াস অদ্যাবধি সভ্য সমাজে সাধনা হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রামগুলিতে যে পরিবর্তন দেখা যাইতেছে তাহা কি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলিয়া মনে হয়? সীমান্তের গ্রামগুলিতে জনচিত্র যে হারে বদলাইয়া যাইতেছে তাহাকে কি সত্যিই রূপান্তর বলা যাইতে পারে? তাহা কি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলিয়া মনে হয়? দেখা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর জনসংখ্যা ১০ লক্ষ করিয়া বাড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জনসংখ্যা বিষয়ক দপ্তরের রিপোর্ট হইতে জানা যাইতেছে যে, ২০০১ সালের আদাম সুমারির নিরীখে পরবর্তী সাত বছরে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ৭৭ লক্ষ অর্থাৎ গড়ে ১০ লক্ষেরও বেশি। ওই রিপোর্টেই বলা হইয়াছে, বাংলাদেশ হইতে অনুপ্রবেশই পশ্চিমবঙ্গে ওই অস্বাভাবিক হারে জনবৃদ্ধির কারণ। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার গত বছরে ২১ এপ্রিল লোকসভায় যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, বাংলাদেশীরা নানাভাবে সীমান্ত পার হইয়া, এদেশে আসিয়াই রেশন কার্ড সংগ্রহ করিয়া রাতারাতি ভারতের নাগরিক হইয়া যাইতেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট হইতে আরও জানা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের ৫৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের ফল নির্ধারণ করিতেছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা। ভবিষ্যতে নির্বাচনের পর কোন্ পার্টি এ রাজ্যে সরকার গড়িবে তাহা ঠিক করিয়া দিবে ওই অনুপ্রবেশকারীরাই। ওই বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হইতেছে কোচবিহার, দুই দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৮ শতাংশের ফলাফল নির্ধারণ করিয়া দেয় অনুপ্রবেশকারী মুসলিম বাংলাদেশীরা। এজন্য ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস প্রমুখ দলগুলি অনুপ্রবেশকারীদের অন্যায় কাজকেও সমর্থন করিতে ব্যস্ত থাকে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর মতে ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিলের জন্য কেন্দ্র চাপ দিলেও, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ আগ্রহ দেখায় সবচেয়ে কম। আজ অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্তের গ্রামগুলিতে হিন্দুরা আতঙ্কিত বোধ করিতেছেন। এখন সীমান্তের বহুগ্রাম হিন্দু শূন্য হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই সীমান্তের মানুষের ভাষা বাংলা হইতে উর্দু হইয়াছে, বেশভূষার বদল ঘটিয়াছে, সর্বোপরি সংস্কৃতির বদল ঘটিতেছে খুব দ্রুত হারে। সীমান্তের বহু অঞ্চল ভৌগোলিক দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গে থাকিলেও সাংস্কৃতিক দিক হইতে কার্যত বাংলাদেশ হইয়া গিয়াছে। হিন্দু যুবতীকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া তুলিয়া লইয়া যাওয়া, হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন, এলাকা হইতে হিন্দু বিতাড়ন, মসজিদ মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ — এইসবই তো বাংলাদেশী সংস্কৃতিরই অঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের পক্ষে ইহা সমূহ বিপদের কারণ।

নববর্ষের নবভাবনা

স্বামী বেদানন্দ

নববর্ষের নতুন ভাবনার মূল কথা হল আমাদের জীবনে যে সব মহৎ গুণ, আদর্শ তথা মূল্যবোধগুলি রয়েছে — যা জীবনকে সমৃদ্ধ করবে, ব্যবহারকে পরিশীলিত করবে, মনকে সুখ ও আনন্দ দেবে, তা নিয়মিত দৃঢ় অনুশীলনের মধ্যে চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জীবনে চলার পথে নানা কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। কত আঘাত, দুঃখ, বেদনা, হতাশা, বিশ্বাসঘাতকতা মনকে গ্রাস করবে, তবু হেরে গেলে চলবে না।

ভারতের মতো পৃথিবীর সর্বত্র এখন অস্থির পরিবেশ। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের আতঙ্ক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমরা নববর্ষে প্রবেশ করেছি। বিগত বছরের নানা স্বপ্ন এখনও পূরণ হয়নি। রয়ে গেছে মনের কোণে কোণে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-আনন্দের চিত্রলিপি। হয়তো তার কিছু পূরণ হবে, আর কিছু কোনও কালেই পূরণ হবে না। এই ভাবেই যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষেরা পৃথিবীর বুকে হেঁটে চলেছে।

মানুষ অতীত দিনের স্মৃতিকে খুব ভালবাসে। কল্পনা করে অনাগত ভবিষ্যৎ। কিন্তু বর্তমানের সচেতন জীবন-যাপনের প্রতি তত হুঁশ নেই। এজন্য মানুষ নিত্যদিন হতাশা ও দুর্দশার শিকার হয়। কারণ বাস্তব পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সব মানুষের থাকে না।

কিন্তু প্রশ্ন হল — বাস্তব পরিবেশ কি? তা হল বেঁচে থাকার সংগ্রাম। মানুষ সুখে-সম্পদে আনন্দে বাঁচতে চায়। এটাই তার প্রকৃতি। নানাবিধ আনন্দ ও সুখ ভোগের জন্য চারপাশের বস্তু সামগ্রী মানুষকে ডাকে। প্রলোভিত হয়ে কম-বেশি সব মানুষই বস্তু সামগ্রীর মোহে পড়ে জাতীয় সংস্কৃতিকে অবমাননা করে। ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি কি? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ত্যাগ এবং সেবা। 'আমি' 'আমার' ভাবনা যতটা সম্ভব ত্যাগ এবং 'তুমি' 'তোমার' ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। ভারতের সুপ্রাচীন আদর্শ হল সত্য, ধৈর্য, নম্রতা, সেবা, আনুগত্য প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের উপর বিশ্বাস। আমাদের দেশে ব্যক্তির মনে, পরিবারের সভ্যদের মনে, সমাজে, রাষ্ট্রে সকল ক্ষেত্রেই উক্ত গুণগুলির প্রতিফলন সকলেই দেখতে চান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল পার্থিব সুখের সন্ধানে উন্মত্তের মতো ছুটতে থাকা মানুষের চিত্তে এইসব গুণের বিকশিত রূপ এখন খুবই কম লক্ষ্য করা যায়। সার্বিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনযাপনের জন্য আমাদের মধ্যে অনীহা এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে নিরাপত্তাহীনতা ও অসুরক্ষা। কমবেশী নানা সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই বিগত বছরগুলি আমরা অতিবাহিত করে এসেছি। এতে আমাদের মনের ও বৌদ্ধিক স্তরে যে খুব বেশী শুভ পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যায় না।

কিন্তু সময়ের মতো মানুষের জীবনও নিত্য পরিবর্তনশীল। মানুষ চিন্তাশক্তি দ্বারা প্রথমে আপনাকে গড়ে। পরে পাশাপাশি সব কিছুর উন্নতি সাধন করে। এখানে চিন্তা বলতে অবশ্য শুভ ও স্বাস্থ্যসম্মত মনোবৃত্তির কথাই বলা হচ্ছে। যদিও সমাজের সর্বস্তরে শুভ চিন্তার বড়ই অভাব। আমরা যত সহজে আমাদের প্রাচীন প্রথা ও আচার-ব্যবহারগুলি ভেঙে ফেলি তত সহজে সত্বর গড়ে তুলতে পারি না। সব কিছুকে ভেঙ্গে ফেলা,

এলোমেলো জীবনযাপন করাকেই আমরা আজকাল আধুনিক জীবন বলি। কিন্তু যথার্থ 'আধুনিক' সংজ্ঞা হল কোনও জিনিসের ভালমন্দ কঠিনভাবে যাচাই করে নিয়ে সবকিছুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করার উপর জোর দেওয়া। যথার্থ আধুনিকমনস্ক কোনও ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। সেই ব্যক্তি তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বলতে পারে যে, "এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমার মূল্যবান জীবনটাকে নিবেদন করতে চাই"। আর যদি একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের মন থাকে তাহলে নিরর্থক একঘেঁয়ে জীবনের গতানুগতিকতা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য চাই। নববর্ষের নবভাবনায় এটাই হল প্রথম পদক্ষেপ। আমরা কেউ অধ্যাপক, কেউ লেখক, কেউ শিল্পী, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ্, সমাজসেবিকা প্রভৃতি হতে চাই। এই হতে চাওয়া ভাবটিকে দিনে দিনে মনন করে বৃদ্ধি করতে হবে। এর জন্য অবশ্য আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। আবার বলছি, আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই নিজ নিজ একটি স্থির লক্ষ্য ও আদর্শ থাকতে হবে এবং এই সুনির্দিষ্ট আদর্শে উপনীত হবার জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা ও সাধনা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন কতগুলি গুণের দিবারাত্র চর্চা করা। যেমন —

(১) আত্মশ্রদ্ধা — আত্মশ্রদ্ধার অর্থ হল নিজের সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা তৈরী করা। আমার মধ্যে কি বিশেষ সহজাত ক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্য আছে তা ভালভাবে মনন করে বুঝতে হবে। নিজেকে যথাযথভাবে বোঝার চেষ্টা করলেই মন শান্ত ও সংযত হয়। মেধা বৃদ্ধি পায় এবং জীবনের কোনও ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা জাগে।

(২) আত্মসচেতনতা — প্রত্যেকদিন নিজের স্বাস্থ্য, খাওয়া-দাওয়া, ব্যক্তিগত ভালমন্দ অভ্যাস, বইপত্র, বন্ধু-বান্ধব — যা কিছু নিজ জীবনের সাথে জড়িত তা আমাদের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করছে কিনা সচেতনভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আত্মনিরীক্ষা খুব বড় জিনিস। যেমনভাবে আচরণ করলে সত্বর জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, তাই করতে হবে এবং অযথা জিনিস বর্জন করতে হবে।

(৩) আত্মনির্ভরতা — প্রত্যেক মানুষকেই ঈশ্বর শক্তি দিয়েছেন। তাই আমাদের সর্বদা নিজের যোগ্যতা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করতে হবে। যারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না তারা জীবনের পথে সাফল্য লাভ করলেও তা ভোগ করতে পারে না, অর্থাৎ নানা দুর্বলতার কারণে প্রকৃত জীবন যাপনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

(৪) আত্মবিশ্বাস — আত্মবিশ্বাস এবং সত্য হল জীবনের গঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস। আমাদের সর্বদা সততা অনুশীলন প্রয়োজন। আর চরিত্রে সততা থাকলেই প্রকৃত আত্মবিশ্বাস লাভ করা যায়। আত্মবিশ্বাসী মানুষ নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে এমন বিশ্বাস গড়ে তোলে যে জীবনের চলার পথে শত ঝঞ্ঝাট ও বাধা-বিপত্তি এলেও নিজের আদর্শের প্রতি সর্বদা অবিচল থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "জগতের ইতিহাস হল কতগুলি আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস।" বাস্তবিক বিশ্বাসের অভাব থেকেই আমাদের মন দৈন্যতায়, বেদনায় ও দুঃখে ভরে যায়। যাঁরা জীবনে গঠনমূলক কিছু করতে চান তাঁদের সর্বদা আত্মবিশ্বাসী হয়ে থাকতে হবে। নববর্ষের নবভাবনায় এই কথাটি সর্বদা মনে রাখতে হবে।

(৫) আত্মমর্যাদা — এটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সুক্ষ্মমূল্যবোধ সম্পন্ন হওয়া ও নৈতিক জীবন যাপনের জন্য দারুণ উৎসাহ থাকা প্রয়োজন। আর কেবলমাত্র এইরকম জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত আত্মমর্যাদা লাভ করা যায়। জীবনের চলার পথে কোনও ক্ষেত্রেই নীতি ও সততার প্রশ্নে আপস করা উচিত নয়। এমনভাবে কঠোর অবস্থান নেওয়া উচিত যাতে আশপাশের সকলে বুঝতে পারে এই লোকটি নীতি ও মূল্যবোধের ব্যাপারে কখনও আপস করবে না। দৃঢ় চিত্ততা ধৈর্যের সাথে অভ্যাস করলেই সমস্ত বাধা বিপত্তি ও ব্যর্থতা ক্রমশ জীবন থেকে কেটে যায় এবং মানুষ আত্মবোধে আলোকিত হয়ে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে আমাদের সাহস দিয়ে বলেছেন, "সব শক্তি তোমার ভিতরে আছে। তোমরা সব করতে পারো। এটা বিশ্বাস কর। উঠে দাঁড়াও এবং তোমাদের ভিতর যে দেবত্ব লুকিয়ে আছে, তা প্রকাশ কর। ওঠো, জাগো, আর ঘুমিয়ো না। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সব অভাব এবং দুঃখ দূর করার শক্তি রয়েছে। এটা বিশ্বাস কর, তাহলেই সেই শক্তি জেগে উঠবে।"

কাজেই নববর্ষের নতুন ভাবনার মূল কথা হল আমাদের জীবনে যে সব মহৎ গুণ, আদর্শ তথা মূল্যবোধগুলি রয়েছে — যা জীবনকে সমৃদ্ধ করবে, ব্যবহারকে পরিশীলিত করবে, মনকে সুখ ও আনন্দ দেবে, তা নিয়মিত দৃঢ় অনুশীলনের মধ্যে চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জীবনে চলার পথে নানা কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। কত আঘাত, দুঃখ, বেদনা, হতাশা, বিশ্বাসঘাতকতা মনকে গ্রাস করবে, তবু হেরে গেলে চলবে না। কারণ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচাই হল জীবন। নববর্ষের প্রত্যেকটা ক্ষণ, প্রতিটি ঘন্টা, প্রত্যেকটা দিন আদর্শময় ভাবনায় ও কর্মে দেহ মন সজাগ হয়ে উঠুক — এটাই আমাদের আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এই আশা ও স্বপ্নই মানবজীবনকে প্রকৃত শান্তির পথ দিতে পারে। আর প্রয়োজন চারপাশের সমস্ত মানুষের প্রতি সৎ ও নীতিপূর্ণ ব্যবহার। সদাচার সম্পন্ন হওয়া। শিষ্টাচার ও সৌজন্য যেন দেহে-মনে-ভাবে-ভাবনায় প্রত্যেকদিন প্রতিটি কাজে বিকশিত হয়ে ওঠে। নিজেকে ভালো রাখতে গেলে মনে রাখা প্রয়োজন চারপাশের মানুষজনদের আগে ভাল রাখার। ভালবাসার চেষ্টা করার কথা। পরিশেষে 'শ্রীশ্রীগীতার' ভাষায় বলি — "হে আমার অমৃতপুত্র মানব সন্তান কর্মের মধ্যেই — তুমি বাঁচো। কর্মেই তোমার জীবন। অতএব পরিশ্রম কর। কঠোর সংগ্রাম কর। কাজ কর। তোমার সকল কর্ম ভগবানের পূজা হয়ে উঠুক। আমিত্ব ত্যাগ করে সব কর্মের ফল এক ও অদ্বিতীয় শক্তি ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করে দাও। প্রশংসা এবং লাভের জন্য লালায়িত হয়ো না। আনন্দ ও দুঃখে জয় ও পরাজয়ে নির্বিকার থাকো এবং সকলের ভিতর পরম এক-কে প্রত্যক্ষ করে জীবনকে ধন্য করে তোল।"

নববর্ষের এই অমৃত সাধনাই যেন আমাদের জীবনে সর্বদা জড়িয়ে থাকে। আর তাহলেই আমাদের সকলের জীবন একদিন যথার্থ সার্থক ও পূর্ণতা লাভ করবে।

অনুপ্রবেশ জাতির নিরাপত্তা ধ্বংসের মুখে রাজ্য সরকার নির্বিকার

বানীপদ সাহা

অতীতের পূর্ব পাকিস্থান, আজকের বাংলাদেশ থেকে অপ্রতিহত গতিতে বেআইনী অনুপ্রবেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যানের অতি ভয়াবহ পরিবর্তন হয়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ, অসম তথা সমগ্র দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিশেষ আকারে বিঘ্নের মুখে পড়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রায় ভেঙে পড়ার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্থানের জনসংখ্যার বাইশ শতাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়। আজকে সেটা কমে সাত শতাংশ দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও পূর্ব অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। সীমান্তে বে-আইনী অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সে রাজ্যে প্রথম থেকেই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় মোটেই নিরাপদে জীবনধারণ করতে পারেনি, আজও পারছে না। প্রতি পদে তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ, অত্যাচার ও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ইসলামি মৌলবাদীরা প্রতিহিংসামূলক মনোভাব নিয়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করছে, ধর্মে আঘাত হানছে এবং দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করছে। বেগম খালেদা জিয়ার আমলে

“সীমান্ত অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশের অনেক উর্দ্ধে। কয়েকটি অঞ্চলে ষাট শতাংশের উপরে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের মিলিয়ে মুসলিম জনসংখ্যা শুধু সংখ্যাগুরু নয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরা কর্তৃত্বের আসনে।”

মুসলিম মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার লাগাম ছাড়া হওয়ার ফলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা আরও অসহায় অবস্থায় কালযাপন করছিল।

১৯৯১ সালের জনগণনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে, ভারতবর্ষে ক্ষয়ে যাওয়া জন উৎপত্তি (Decadence growth) ২৩.৫৯ শতাংশ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেটা ২৪.৫৫ শতাংশ। রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অবস্থা আরও সঙ্গীন। উল্লেখযোগ্য, সীমান্ত অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশের অনেক উর্দ্ধে। কয়েকটি অঞ্চলে ষাট শতাংশের উপরে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের মিলিয়ে মুসলিম জনসংখ্যা শুধু সংখ্যাগুরু নয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরা কর্তৃত্বের আসনে। অনেকে মনে করে, বাংলাদেশ থেকে শুধু হিন্দুরা প্রবেশ করছে। এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। বাংলাদেশ থেকে বহু সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী। সরকারি সূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯৮০ সালে ১০৫৩৩ জন বাংলাদেশী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল। এদের মধ্যে ৬৬৪৫ জন মুসলমান। ১৯৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২৭০৭৫ জন প্রবেশকারীর মধ্যে ২০০৩৪ জন মুসলমান। ১৯৯১

সালে পশ্চিমবঙ্গে ১,০৩,৮৭৭ জন অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে ৫৮ হাজার ২৯০ জন মুসলমান। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে ৩৩,১৪,৯৭১ জন বৈধ কাগজ পত্র নিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, এদের মধ্যে ১,৫৭৯৩৬ মুসলমান সমেত ৫,৪৪,৪৭৪ জন বাংলাদেশে ফিরে যায়নি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে আজকে প্রায় চৌদ্দ কোটি। জনসংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। অর্থনৈতিক অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক, শিল্প অতি নগণ্য। দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার অভাব। রাজনৈতিক অস্থিরতা, মৌলবাদীদের দাপট, ধর্মীয় প্রভাবে সরকারের কর্মতৎপরতা, প্রশাসনে অবিশ্বাস্য দুর্নীতি ইত্যাদি মিলিয়ে জনগণের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কাজেই অবৈধ উপায়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ যেন আশীর্বাদ। ভারতে ছোটখাটো জীবনধারণের প্রচুর সুযোগ, জনগণ উদার, সহজেই অপরকে আপন করে নেয়, ধর্মের গোড়ামী নেই, নিরাপত্তা যথেষ্ট। সুতরাং বাঁচার তাগিদে গোপনে বা উৎকোচের সাহায্যে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীদের খুশী করে ভারতে প্রবেশ জীবন সমস্যা সমাধানের রাস্তা অনেক প্রশস্ত হয়ে উঠে। এভিন্ন অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং স্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস রাজনৈতিক নেতাদের দৌলতে আরও সহজ হয়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে, দু'দিক থেকে অনুপ্রবেশকারীগণ উৎসাহ পেয়ে থাকে। প্রথমত বাংলাদেশের একদল বুদ্ধিজীবী বেআইনী অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করে। তারা যুক্তি দেখান যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, তাদের বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত জমির প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, জীবিকা অন্বেষণের জন্য তাদের স্বদেশ ছেড়ে অন্য রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর বহু দেশে এ রকম ঘটনা ঘটেছে। ইউরোপ থেকে হাজার হাজার মানুষ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকায় এবং কানাডায় আশ্রয় নিয়েছে। যুক্তির সমর্থনে লেবেনস্টাম থিওরী (doctrime of lebenstaum) তুলে ধরেন। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, আর্থ-সামাজিক কারণে অন্য রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ মেনে নিতেই হবে। সুতরাং অনুপ্রবেশকারীগণ দেশবাসী থেকে উৎসাহ পেয়ে বেআইনী অনুপ্রবেশকে অন্যায় বা অনৈতিক বলে মেনে নেয় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ভারতের বহু রাজনৈতিক দল ও নেতা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। কারণ, অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্যে শক্ত এক 'ভোট ব্যাঙ্ক' (Vote Bank) তৈরি করে নির্বাচনে প্রার্থী বা দলের সাফল্য প্রায় নিশ্চিত করে তোলা যায়। অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ না নিয়ে, তাদের ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করে দেওয়া, প্রশাসনের উপর প্রভাব খাটিয়ে তাদের রেশন কার্ড ইস্যু করতে মদত দেওয়া, ভোটার লিস্টে নাম তুলে তাদের ভারতের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া, পার্টির সাহায্যে তাদের নানাভাবে ভারতীয় নাগরিক করে তোলা যাতে, কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে অনুপ্রবেশকারীরা দলবেঁধে বা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রার্থী বা দলকে সমর্থন করে। রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এ কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ সমস্যা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নজরে আনা হলে, তিনি কোনও গুরুত্ব না দিয়ে সমস্যাটি এড়িয়ে যেতে চাইতেন। তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার টি এন সেসন সীমান্তে বসবাসকারী মানুষদের জন্য ফটো আইডেনটিটি কার্ড চালু করার প্রস্তাব রাখলেন। শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে, রাজ্যে এ রকম কোনও সমস্যাই নেই। এ প্রস্তাব কার্যকরী করতে গেলে, রাজ্য সরকার যে সহযোগিতা করবে না, সেটাও আকার-ইঙ্গিতে পরিষ্কার হয়ে গেছিল। পার্টির তরফ থেকে প্রচার করা হল যে এই প্রস্তাব লাগু হলে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর হয়রানির সম্ভাবনা প্রবল হবে। আসলে এ পদক্ষেপে ভোট ব্যাঙ্কে টান পড়বে। সে কারণে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব পরোক্ষে বানচাল করে দেওয়া হয়েছিল।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশের বিভিন্ন অংশে। অবৈধ অনুপ্রবেশের ব্যাপকতা দেশের সংহতি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে অবিলম্বে ধ্বংসের মুখে নিয়ে আসবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করেও, এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বা নির্মূল করতে কোনও বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। কারণ, এখানে সংখ্যালঘুদের তোষণনীতি বিশেষ বাঁধার কাজ করছে। সব দল ও সরকার ভোট পাওয়ার স্বার্থে সংখ্যালঘু মুসলমানদের তোষামোদ করে শাসন চালাতে পছন্দ করে। সুতরাং আগামী দিনে এ সমস্যার আদৌ সমাধান হবে কি না, সে বিষয়ে দেশপ্রেমী মানুষের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিহার বিধানসভায় পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যায়, প্রায় ১৮ লক্ষ হিন্দী ভাষাভাষী বাংলাদেশীরা অবৈধ উপায়ে প্রবেশ করে রাজ্যের ১২টি জেলায় আস্তানা গেড়েছে। বিহারের কিষাণগঞ্জ জেলার নয়টি ব্লকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী আশ্রয় নিয়েছে। রাজধানী দিল্লীর গ্রেটার কৈলাশ, জাহাঙ্গীরপুরী, যমুনার পূর্ব পাড় এলাকায় প্রায় দেড় লক্ষ বাংলাদেশী ডেরা বেঁধেছে। মুম্বাই শহরের আশেপাশে প্রায় দুই লক্ষ বাংলাদেশী বসবাস করছে। অনেকে নাম বদলে হিন্দু নাম রেখেছে। মহিলারা বাড়ি-বাড়ি পরিচারিকার কাজ করছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বহু হিন্দীভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলাদেশে থেকে যায়। তাদের আশা ছিল, পাকিস্থান তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং তাদের পাকিস্থানে স্থান দেবে। কিন্তু পাকিস্থান তাদের পুরোপুরি অস্বীকার করে। এই অসহায় মানুষগুলি বাংলাদেশে সসম্মানে বাস করতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অবশেষে গোপনে ভারতে প্রবেশ করে নানা রাজ্যের হিন্দিভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যায়। ভারতীয় মুসলমানগণ এদের গোপনে সাহায্য করে এবং বসবাসের নানা সুযোগ-সুবিধা দরাজ হাতে দিয়ে দেয়। বিহারের কয়েকটি জেলা, উত্তরপ্রদেশের আজমগড়, জৌনপুর, বারাবঙ্কি, বেরেলি জেলা এদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে। খোদ কলকাতা এবং শহরের সংলগ্ন এলাকায় বহু হিন্দিভাষী বাংলাদেশী আশ্রয় নেয়। শহরের মেটিয়াব্রুজ, খিদিরপুর, পার্কসার্কাস, রাজাবাজার, কলাবাগান, হাওড়া শহর এবং হুগলীর শিল্প এলাকায় এরা আশ্রয় নেয়। মোটামুটি হিসাবে ধরা হয়েছে, প্রায় আট লক্ষ বাংলাদেশী কলকাতা শহরে ও শহর সন্নিহিত এলাকায় আশ্রয় নেয়। দুর্ভাগ্যবশত সিপিএমে-র নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার এ ভয়াবহ সমস্যা-কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে। সরকার এদের খুঁজে বের করে,

আইনী ব্যবস্থা গ্রহণে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। এখানেও সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক নীতি ও সংখ্যালঘুদের তোষণ-নীতি দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে অগ্রাধিকার পায়। দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিমবঙ্গে জনগণ লাগামহীন উদারতা দেখায়, তাদের কাছে দেশের সংহতি, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা গৌণ বলে মনে হয়। আর রাজ্য সরকার, তথাকথিত সর্বহারাদের সরকার, ভোটের স্বার্থে যে কোনও অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপোশ করতে প্রস্তুত।

অসমে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যকে বিভাজনের পথে ঠেলে দিতে পারে। বহু জেলায় অনুপ্রবেশকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলাদেশ থেকে জেহাদী সন্ত্রাসবাদীরা এদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ভারত বিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছে। অসমের আলফা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। আলফা গোষ্ঠীর বলিষ্ঠ নেতাগণ বাংলাদেশের মাটি থেকে পরেই অসম রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশি।

উপরোক্ত অনুপ্রবেশ সমস্যা দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উপর গভীর আঘাত হানছে। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বহু অঞ্চলে অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে প্রকৃত ভারতীয়গণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। ডেমোগ্রাফির পরিবর্তনের ফলে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। দুর্ভাগ্যবশত, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যার বিপদ বুঝেও নির্লিপ্ত রয়েছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতা ও অর্থ ভোগ করা। কাজেই তারা ভোট ব্যাঙ্ক ও সংখ্যালঘু খোসামোদ নীতি বর্জন করে শাসন চালাতে মোটেই আগ্রহী নয়। তথাকথিত পশ্চিম-বঙ্গের উদার জনগণ নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। উদারতার ঠুনকো বাহবা পেয়েই তারা খুশী ও সন্তুষ্ট।

আজকে বাংলাদেশে দেড় কোটি হিন্দুর ভবিষ্যত কি — এ নিয়ে কোনও নেতাই আগ্রহ দেখায় না।

অবৈধ অনুপ্রবেশের ব্যাপকতা দেশের সংহতি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে অবিলম্বে ধ্বংসের মুখে নিয়ে আসবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করেও, এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বা নির্মূল করতে কোনও বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেনা। কারণ, এখানে সংখ্যালঘুদের তোষণনীতি বিশেষ বাঁধার কাজ করছে।

সন্ত্রাসবাদী কার্যে নির্দেশ দিয়ে চলেছে। বাংলাদেশে ৯৩টি সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণের জন্য ক্যাম্প চালু হয়েছে। এদের সঙ্গে পাকিস্থানের আই এস আই-র প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের জনসভায় বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা যায়। সম্প্রতি অসম ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (AUDF), মুম্বাই-এর এক ব্যবসায়ী বদরুদ্দিন আজমলের নেতৃত্বে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে। ইতিমধ্যে এ দল অসম বিধান সভায় দশটি আসন লাভ করেছে। বদরুদ্দিন আজমল দুটি বিধান সভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুটো আসনেই নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের লোকসভার নির্বাচনে AUDF অসম ছাড়াও বিহার, ইউ পি রাজ্যে কয়েকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আজমলের লক্ষ্য, সারা ভারতে মুসলিম সংগঠন ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ক্ষমতা দখল করা। সংগঠনটি পুরোপুরি ইসলামি মৌলবাদীদের লাইনে চলছে। সংখ্যালঘুদের সংগঠিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মানসে এরা এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীগণ এ সংস্থার প্রধান শক্তি। উল্লেখযোগ্য, কাশ্মীরের

মসজিদ-মাদ্রাসা দিন দিন বাড়ছে

প্রাণ প্রতিম পাল

লাগাতার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ফলে কোচবিহার জেলার জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে ভয়াবহ সমস্যায় পড়েছেন জেলাবাসী।

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, হলদিবাড়ী, দিনহাটা এবং মাথাভাঙ্গা মহকুমার বেশ কিছুটা অংশে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। এইসব মহকুমার সীমান্ত লাগোয়া ভারতীয় গ্রামগুলো আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। একদিকে সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে, অন্যদিকে চোরাচালান, ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে চলেছে অহরহ। ফলে সীমান্তে ভারতীয় গ্রামের গ্রামবাসীরা দুর্বিষহ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

কোচবিহার শহর থেকে মাত্র ২২ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট মহকুমা শহর তুফানগঞ্জ। পর্যটনের দৃষ্টিতে, জেলার পর্যটন মানচিত্রে এই মহকুমার একটা আলাদা জায়গা রয়েছে। তুফানগঞ্জ মহকুমা শহর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত মাত্র ১৭ কিলোমিটার। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের থাবা ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করেছে এই মহকুমাকে।

তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের অধীনে রয়েছে সীমান্তবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর— বালাভূত। বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তিনটি মৌজা রয়েছে। মৌজা তিনটি হল বালাভূত, ঝাউকুঠি এবং গোপালের কুঠি। মৌজা তিনটি আয়তনে ৯৪৯৪.৮০ একর। এই মৌজা তিনটির ভিতর ১১টি গ্রাম রয়েছে। বালাভূত ও ঝাউকুঠি মৌজা দুটি বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন। অন্যদিকে গোপালের কুঠির অবস্থান অসম সীমান্তে। বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস থেকে বাংলাদেশ মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে। মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে রায়ডাক নদী। নদীপথেই বেশি চোরাচালন হয়ে থাকে। বি এস এফ এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত দপ্তরের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়েও বন্ধ করা যায়নি চোরাচালান।

তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত অপর গ্রাম পঞ্চায়েত দেওচড়াই। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি গ্রাম বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা। সীমান্ত গ্রাম কৃষ্ণপুর, বক্সিরকুঠি, চৌখসী, বলরামপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি সমস্যাদীর্ণ। গরু চোরাচালানের প্রধান করিডর হিসেবে চিহ্নিত এখানকার গ্রামগুলি। জনসংখ্যার দৃষ্টিতে এলাকায় ৬০ শতাংশ মুসলিম এবং ৪০ শতাংশ হিন্দু বসবাস করে।

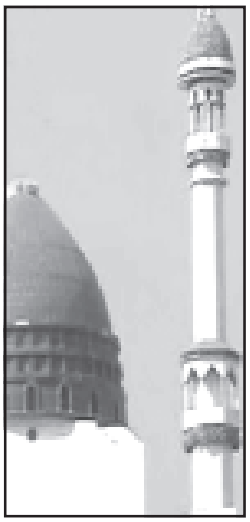

দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১টি সরকারি মাদ্রাসা থাকলেও বেসরকারি বা অনুমোদনহীন মাদ্রাসা ও মোকতবের সংখ্যা ২৫

বালাভূত এবং দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রামগুলিতে মসজিদ-মাদ্রাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সীমান্ত গ্রামগুলিতে ব্যাপকহারে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ফলে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। ছিনতাই, ডাকাতি, ধর্ষণের মতো নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভয়ে, আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতেবাধ্য হচ্ছেন অনেকে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২-৩ কিলোমিটারের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে মসজিদ-মাদ্রাসা। বালাভূত মৌজার চর বালাভূত হিন্দু শূন্য গ্রামে পরিণত হয়েছে। একই রকম অবস্থা তৈরি হতে চলেছে সীমান্তের অন্যান্য গ্রামে। বি এস এফের ১১৩ নং ব্যাটালিয়নের এক জওয়ান বলেন, দেওচড়াই ও বালাভূত এলাকায় ৪৮ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ২৪ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়েছে। রায়ডাক, কালজানির মতো ছোট-বড় নদী থাকায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে সমস্যা হচ্ছে। ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অনেকটা অংশই উন্মুক্ত। আর এই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে চোরাকারবারীরা।

দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রামগুলির চেহারা অনুপ্রবেশের ফলে পাল্টে যাচ্ছে। ওই অঞ্চলে ২৭টি মসজিদ রয়েছে। এছাড়া ১০টি হুজুরিঘর (যেখানে নামাজ পড়া হয়) রয়েছে। বিশেষ সূত্রে খবর, এলাকায় ১টি সরকারি মাদ্রাসা থাকলেও বেসরকারি বা

মাদ্রাসায় কচিকাচারা।

অনুমোদনহীন মাদ্রাসা ও মোকতবের সংখ্যা ২৫। একইরকম চিত্র দেখা যাবে বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে। ওই বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে ৩০টি ছোট-বড় মসজিদ, ১টি সরকারি মাদ্রাসা রয়েছে। এছাড়া ৪টি হুজুরিঘরসহ ২৬টি মাদ্রাসা মোকতব এলাকায় রয়েছে বলে বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে। সীমান্ত এলাকায় গজিয়ে ওঠা এইসব মসজিদ-মাদ্রাসাকে ভাল চোখে দেখছে না গোয়েন্দা দপ্তর। সীমান্তে প্রহরারত সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের কাজ-কর্ম নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বর্তমানে মোবাইল পরিষেবা প্রত্যন্ত সীমান্ত গ্রামগুলিতে পৌঁছে গিয়েছে। ফলে খুব সহজেই চোরাচালানের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার মোবাইল পরিষেবাকে ব্যবহার করছে চোরাকারবারীরা। একই রকমভাবে বাংলাদেশের মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে দুস্কৃতীরা। সরকারি সংস্থা বি এস এন এল-এর নেটওয়ার্ক সিগন্যাল বর্ডারের অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয় বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানির নেটওয়ার্ক সীমান্তের ২-৩ কিলোমিটার ভিতরে রীতিমতো কাজ করে। নদী পেরিয়ে চর বালাভূতে স্থানীয় এক যুবককে বাংলাদেশের সিম কার্ড ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। ভারত থেকে উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়া কিংবা সেদেশ থেকে ভারতে আসা খুব যে একটা কঠিন নয়, তা ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল। কি কি জিনিস চোরাচালন হয়? ভারত থেকে গরু সব থেকে বেশি এক শ্রেণীর দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশে চোরাচালান হয়। নিরাপদে গরু সীমান্ত পার করিয়ে দিতে পারলে গরু পিছু ২০০ টাকা পাওয়া যায়। তবে এই দর সময় বিশেষে ওঠা-নামা করে। বাংলাদেশ থেকে কেরোসিন তেল, ডিজেল, কাপড় ভারতে আসে। এইসব কাপড় মহকুমা শহরগুলিতে কম দামে বিক্রি হয়। প্রশাসন এবং বি এস এফের কড়া নজরের ফলে তেল, কাপড়, নারী চোরাচালান অস্থায়ীভাবে রোখা গেলেও বন্ধ করা যায়নি গরু চোরাচালান। বাংলাদেশী ডাকাত দল রাতের অন্ধকারে ভারতীয় সীমান্ত গ্রামগুলিতে ঢুকে গরু চুরি করে। এছাড়া লুঠ- পাঠ চালায়, ধর্ষণ করে আবার বাংলাদেশে ফিরে যায়। ফলে আতঙ্কে দিন কাটাতে হয় গ্রামবাসীদের।

রাজ্য থেকে কেন্দ্র, সব সরকারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুপ্রবেশকে মদত দিয়ে চলছে। ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি বোঝে না সীমান্তের গ্রামের নির্যাতিত মানুষ। বাংলাদেশী দুস্কৃতীদের হাত থেকে নিজের সম্পত্তি, ঘরের সম্মানকে রক্ষা করতে তারা চান শুধু সহযোগিতা।

সীমান্তের সমস্যা ঃ ছিটমহল

মনমোহন রায়

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাসে একটি জঘন্য কাজ হয়েছে — দেশ বিভাগ। কবে কীভাবে এই দুষ্ট ক্ষত দূর হবে জানি না। একমাত্র ভগবান পারেন এই ক্ষত সারাতে।

দেশ বিভাগ থেকে যাবতীয় সমস্যার সৃষ্টি। একটি গ্রামে জনৈক পঞ্চায়েত সদস্যের কথা জানি, সে কোনও প্রধান হতে চায় না। তার লক্ষ্য সদস্য হওয়া, যাতে সীমান্ত রক্ষীরা তাকে সম্মান করে এবং সেই সুযোগে সে প্রতি মাসে রাত্রিবেলা সীমান্ত পারাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারে। এভাবেই বছরের পর বছর তার আমদানী হয়।

সীমান্তে সর্বাপেক্ষা বেশি পার হয় গো-সম্পদ। গরুগুলি বোধ হয় বোঝে। আর সেজন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে সীমান্ত পার হয়। অভিশাপ দিতে দিতে যায়। একজন কৃষকের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় গরু চুরির ফলে। সেজন্য গরু চুরি বন্ধ করতে পারলে এবং গো-পাচার বন্ধ হলে গ্রামের সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার হবে।

ছিটমহল অর্থাৎ ভূ-দ্বীপ। এগুলি আরও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মাত্র এক মাইল ঘুরে গেলে হয়। কিন্তু ৫ মাইল বৈধভাবে ঘুরে তবে নিজ দেশের সীমানা অতিক্রম করা যায়। '৪৭ সাল থেকে এই ছিটমহল সমস্যাগুলি বর্তমান। ভারতীয় ছিটমহলের সংখ্যা ১৩২ এবং বাংলাদেশী ছিটমহলের সংখ্যা ৯৫। এগুলির সুষ্ঠু বিনিময় না হলে সীমানা অ-সুরক্ষিত থেকেই যাবে। তিন বিঘা আন্দোলনের সময় ১৯৯২ সালে স্বয়ং জ্যোতি বসু জনসমক্ষে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, একমাসের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের আলোচনা শুরু হবে, তিন বিঘা হস্তান্তর হলে। কিন্তু জনসমক্ষে দেওয়া '৯২ সালের সেই প্রতিশ্রুতি দীর্ঘ ১৭ বছরেও পালিত হয়নি। এই সময়ে তিস্তা নদী দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। ছিটমহলের এই সমস্যাকে অনেক জাতীয় নেতা জানেন না বা বুঝতে পারেন না। ফলে এই সমস্যা একটা স্থায়ীরূপ ধারণ করেছে।

কাঁটাতারের বেড়া কোনও সমাধান নয়। অনেকে ভাবছেন কাঁটাতারের বেড়া দিলেই সমস্যা সমাধান হবে। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে এই বেড়া ডিঙিয়েও গরু পাচার চলছে।

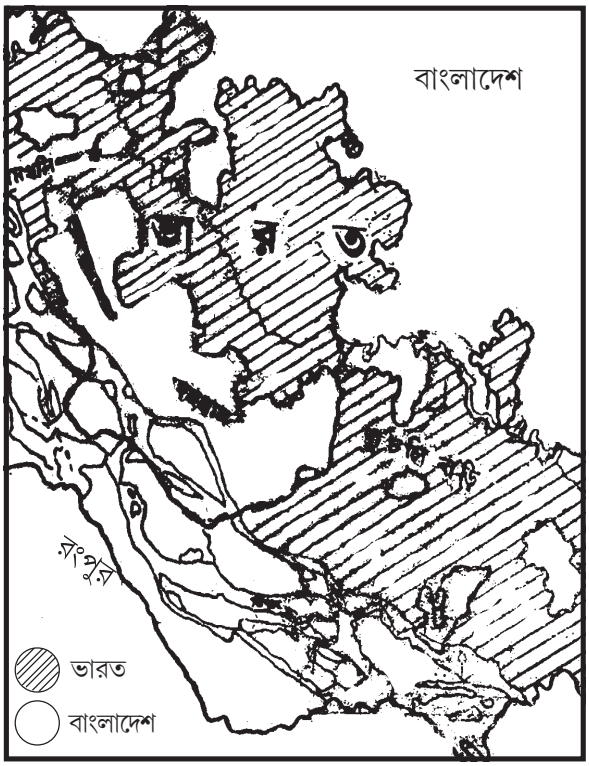

ভারতের বুকে বাংলাদেশের দুই ছিটমহল — আংড়াপোতা ও দহগ্রাম।

দীর্ঘকাল ধরে অনুপ্রবেশে অব্যাহত। যখনই কোনও দৈব দুর্বিপাক — প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি হোক, এক ঝাঁক অনুপ্রবেশকারী ভারতে আসবে। তাদের দাবি তারা ভারতীয় নাগরিক। বাংলাদেশী আক্রমণের ফলে তারা ভিটা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এখন চাই পুনর্বাসন। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এভাবে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। ভুটান সীমান্তে জয়গাঁ ও অন্য আরও অনেক জায়গায় যে অবৈধ কলোনী গড়ে উঠেছে তার কারণ বাংলাদেশী মুসলিমরা পরিকল্পিত ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে।

সীমান্তের স্পর্শকাতর গ্রামগুলিই চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য

উদয় সরকার

তিনদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ঘেরা আপাত শান্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আটটি ব্লকের মধ্যে ছয়টির সঙ্গেই রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫২ কিমি। এই ছয়টি ব্লকের মোট ৫৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২১টি বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। আর এজন্যই আন্তর্জাতিক সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে কম-বেশি এক কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে প্রায় দু'শোটি গ্রাম — যা জেলার মোট গ্রামের প্রায় দশ শতাংশ। সেজন্য এই ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ না থাকায়, কয়েকটি বিশেষ স্পর্শকাতর গ্রাম নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

চৌরা গ্রামে মসজিদ, যার ইমাম জবরুল মোল্লা একজন অনুপ্রবেশকারী।

জেলার সার্বিক চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৯১ থেকে ২০০১ এই দশ বছরে জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা জেলার মোট জনসংখ্যার ২৩.২০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৪.০২ শতাংশ। পক্ষান্তরে হিন্দুসংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল মোট জনসংখ্যার ৭৫.৩০ শতাংশ। যা ২০০১ সালে জনগণনা অনুসারে কমে দাঁড়ায় ৭৪.০১ শতাংশে। আপাতদৃষ্টিতে এই বৃদ্ধি ও হ্রাস খুব সামান্য হলেও এটাকে অবজ্ঞা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বি এস এফের একজন কোম্পানী কমান্ডার তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানালেন বর্তমানে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে এসে সীমান্তবর্তী এলাকার সুবিধাজনক কোনও গ্রাম থেকে স্থানীয় সাহায্যকারী এজেন্টদের মাধ্যমে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ডসহ নাগরিকত্ব প্রমাণের নানা ধরনের কাগজ-পত্র বানিয়ে নিয়ে অন্য জেলায় অথবা দিল্লী, গুজরাট, মুম্বাই সহ অন্যান্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। ফলে জেলার পরিসংখ্যানে হ্রাস-বৃদ্ধির সঠিক প্রতিফলন হচ্ছেনা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে গোটা দেশের পরিসংখ্যানে তা কিছুটা হলেও বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং প্রভূত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সীমান্তের গ্রামগুলির অবস্থানগত কারণে এবং গ্রামবাসীদের একটা বড় অংশের সহযোগিতায় অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা দীর্ঘদিন থেকে অবিরত ঘটে চলেছে। মানব শরীরের ক্যানসার আক্রান্ত অঙ্গ যেমন নীরবে ভিতরে ভিতরে নষ্ট হয়ে যায়, ব্যক্তি যখন জানতে পারে তখন আক্রান্ত অঙ্গ কেটে শরীর থেকে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না, ঠিক তেমনি ভারতের অপূরণীয় স্থায়ী ক্ষতি হয়ে চলেছে অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্ত এলাকায় গত দশ বছরে নতুন নতুন অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে। যেগুলির অধিকাংশের কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই। যেগুলিতে কেবল কায়দা শেখানো হয়। স্থানীয় এলাকার ছেলেদের সঙ্গে বাইরে থেকে ছোট ছোট ছেলেরাও সেখানে এসে থাকে ও শিক্ষা নেয়। মাদ্রাসার মৌলবী ও অন্য শিক্ষকরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় এলাকার বাইরের। তবে থাকার ব্যবস্থা মাদ্রাসায় হলেও, খাওয়ার ব্যবস্থা স্থানীয় মুসলমান গ্রামবাসীরা করে থাকে। প্রতিদিন দুপুরে মাদ্রাসার ছোট-বড় ছেলেরা মুসলমানি পাঞ্জাবি, পাজামা টুপি পরে দল বেঁধে এ পাড়া ওপাড়া খেতে যায়, যাদের প্রত্যেকের হাতে দুটো-তিনটে বাটিওয়ালা স্টিলের টিফিন ক্যারিয়ার থাকে, যাতে করে রাতের খাবার নিয়ে আসে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা লাগোয়া ওপারে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতেও প্রচুর মসজিদ, মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে এবং এ কারণে জেলার হিলি, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর ব্লকের বেশ কিছু মসজিদ মাদ্রাসা সম্পর্কে যা তথ্য মিলেছে তা উদ্বেগজনক। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে সীমান্তের খুব কাছে অনেক মাদ্রাসা, মসজিদ গড়ে উঠেছে।

হিলি ব্লকের এরকম মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে ধলপাড়া অঞ্চলের লস্করপুর গ্রামে। অনেকগুলি কারণে স্থানীয় এলাকার অনেক সচেতন নাগরিক এবং জেলার গোয়েন্দা বিভাগ এই মাদ্রাসার কাজকর্মে সন্দিহান। গ্রামটি মুসলমান অধ্যুষিত এবং সীমান্তের খুব কাছে অবস্থিত। পাশের গ্রাম পাঞ্জুন অঞ্চলের গোসাইপুর ও চকগোপাল — দুটিই সীমান্ত সড়কের ওপারে এবং কাঁটাতারের বেড়া বিহীন এলাকায়। গ্রামের অবস্থানগত কারণে থ্রি-ফেজ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। নির্বাচক তালিকা ২০০৯, অংশ নং ১৩৪ অনুসারে গোসাইপুরের মোট ভোটার ৩৪৩ জন। এদের মধ্যে মুসলমান ১৭৮ জন। বাকি ১৬৫ জনের মধ্যে প্রায় ৫০-৬০ জন খৃস্টান ভোটার। কেননা গোসাইপুর গ্রামে সীমান্ত সড়কের পাশে একটি সম্প্রতি নির্মিত চার্চ আছে এবং গ্রামের এক বয়স্ক ব্যক্তির কাছে জানা গেল গ্রামে প্রায় ৩০-৩৫ ঘর তফশিলি উপজাতির মানুষ খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। সুতরাং এটা বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই গ্রামটিতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু এবং তথাকথিত সংখ্যালঘুরাই সংখ্যাগুরু। আবার তালিকার ওই অংশেরই ভাগ নং-২ অনুসারে চক গোপালের ভোটার ১৮১ জন। যার মধ্যে কেবল দু'জন হিন্দু, বাকি ১৭৯ জনই মুসলমান। বেড়া না থাকায় এই দুটি গ্রাম থেকে বাংলাদেশে যাওয়া অথবা বাংলাদেশ থেকে এসে এ দুটি গ্রামে আশ্রয় নেওয়া খুবই সহজ। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা সাধারণত সীমান্ত সড়কের উপরে প্রহরারত এবং সংখ্যাতেও পর্যাপ্ত নয়। গ্রামের ভিতরে ঢুকে নজরদারি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই স্থানীয় গ্রামবাসীর সাহায্য নিয়ে বি এস এফের নজর এড়িয়ে এদেশে ঢুকে পরা কারও পক্ষেই অসম্ভব নয়। সীমান্ত চৌকিতে প্রহরারত বি এস এফের জওয়ান একথা মেনে নিয়ে জানালেন, এরকম এলাকায় বদলি হয়ে এসে স্থানীয় লোকদের চিনতেই অনেক সময় তাক লেগে যায়। সেই সময়ের মধ্যে স্বল্প পরিচিত ভারতীয়দের সঙ্গে অপরিচিত বিদেশীও ঢুকে যাওয়া অসম্ভব নয়। আবার মুসলমান অধ্যুষিত সীমান্ত এলাকায় দেখা যায় অনেকেই এসে আমাদের জওয়ানদের সঙ্গে নানাভাবে খুব ঘনিষ্ঠ হতে চায়। ভালোভাবে খোঁজ নিলে জানা যায় এদের অধিকাংশ হয় নিজেরা মাল পারাপারের সঙ্গে যুক্ত, অথবা বড় কোনও স্মাগলারের হয়ে কাজ করে। তাই এরা যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করে তা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের স্বার্থে।

সীমান্তের প্রায় জিরো পয়েন্টে অবস্থিত গোসাইপুর, চকগোপালের মতো গ্রাম দিয়ে বি এস এফের নজর এড়িয়ে সীমান্ত সড়ক টপকে লস্করপুরে এসে কোনও বাংলাদেশী মুসলমান মাদ্রাসায় আশ্রয় নেয় এবং জেলার অন্যস্থান থেকে আগত মুসলমানদের সঙ্গে একই রকমের সাজ-পোশাকে ভারতের অভ্যন্তরে অনায়াসে ঢুকে পরতে পারে বলে স্থানীয় অনেকের এবং গোয়েন্দাদের সন্দেহ। তাছাড়া ত্রিমোহিনী-হিলি অঞ্চলের বেশ কয়েকজন বিতর্কিত ব্যবসায়ী — যারা এই অঞ্চলের সব ধরনের অবৈধ কাজকর্মের মূল মদতদাতা এবং এলাকায় বেশ পরিচিত — এই মাদ্রাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সম্ভাবনা থাকায় গোয়েন্দাদের সন্দেহ আরও বেড়ে গেছে। বালুরঘাট ব্লকের কুরমাইল গ্রামের এরকমই এক বীজ ব্যবসায়ীর গুদামে সম্প্রতি জেলা কৃষি দপ্তর হানা দিয়ে প্রায় দশ কোটি টাকার মতো কমদামের পাটবীজ আটক করে যেগুলি জাল সার্টিফিকেট লাগিয়ে সার্টিফায়েড বীজ হিসেবে বেশি দামে বিক্রির জন্য মজুত করা হয়েছিল। ব্যবসায়ীর নাম আলাউদ্দিন মন্ডল। যাঁর বিষয়ে 'স্বস্তিকা'র ৭ জুলাই ২০০৮ সংখ্যার একটি প্রবন্ধে আলোচনাও করা হয়েছে।

কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর ব্লকের সীমান্ত লাগোয়া অনেক গ্রামই ধীরে ধীরে হিন্দু শূন্য হয়ে পড়ছে অথবা হিন্দুর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। ফলে জাতীয় নিরাপত্তার দিকে থেকে গ্রামগুলি সমস্যাবহুল হয়ে পড়ছে। অবৈধ অনুপ্রবেশসহ চোরাচালান, জাল টাকার কারবার, গরু-পাচার, অবৈধ অস্ত্রের কারবার বেড়েই চলেছে। একের পর এক সীমান্তে স্থাপিত হচ্ছে মাদ্রাসা, মসজিদ, মক্তবর। যেগুলির চাকচিক্য এলাকার দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। গঙ্গারামপুর থানার অশোকগ্রাম অঞ্চলের দোসুঠা-ফরদিপুর গ্রামের কাশেমমোড় এলাকায় নির্মিত মসজিদ ও মাদ্রাসা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র এক কিমি দূরে। এই মাদ্রাসার কাছাকাছি আরও দু'টি মাদ্রাসা ও সংলগ্ন মসজিদ আছে। কুমারগঞ্জ থানার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম হরিশ্চন্দ্রপুর, দাউদপুর, সমজিয়া, জাখিরপুর, রাইখন, মঞ্জুরীচক ইত্যাদি এলাকায় অবস্থিত অনুমোদিত মাদ্রাসা ও মসজিদগুলিতে হামেশাই অপরিচিত মানুষের আসা-যাওয়া লেগেই থাকে বলে প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয় না। পুলিশ তদন্ত না করে উল্টে অভিযোগকারীকে অভিযোগ প্রমাণ করতে বলা হয় এই ভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ আর অভিযোগ করতে এগিয়ে আসে না। যা ঘটছে ঘটুক, সবার যা হবে আমারও তাই হবে — এই ভেবে চুপ করে থাকে। আর এই সুযোগে ভারত বিরোধী শক্তি তাদের নীল নক্সা রূপায়ণে এগিয়ে চলেছে।

বেড়াবিহীন খোলা সীমান্ত। বাঁ দিকে পিলার, ডান দিকে বাংলাদেশ যাওয়ার আলরাস্তা।

হাড়িপুকুর গ্রামের জিরো পয়েন্টে অবস্থিত বাংলাদেশের মসজিদ।

কাঁটাতারের বেড়া হওয়ায় যাদের চাষের জমি বেড়ার ওপারে পরেছে, চাষবাসে তাদের অসুবিধা হয় বটে। কারণ পারাপারের গেট নির্দিষ্ট সময়সূচী মেনে, খোলা ও বন্ধ করা হয়। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এটুকু অসুবিধা মেনে নিতে অধিকাংশ সচেতন কৃষক ভাই-ই রাজি থাকেন। কিন্তু গেট খুলতে সময়ের একটু হের-ফের হলেই স্থানীয় রাজনৈতিক দলের কিছু নেতা — যাদের অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দু'নম্বরি, চোরাকারবারীর সঙ্গে যুক্ত থাকে — নিজেদের লাভ-লোকসান হিসেব করে জনগণকে বি এস এফের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। বি এস এফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। এ বিষয়ে সীমান্তে প্রহরারত এক জওয়ানের সঙ্গে আলোচনায় অনেক তথ্য জানা গেল। তাঁর কথায় চাকুরি সূত্রে অন্য রাজ্য থেকে এসে আমরা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছি। অনেক বি এস এফ জওয়ানেরও ত্রুটি আছে। যেমন অর্থের বিনিময়ে কাউকে মাল পারাপারের সুযোগ করে দেওয়া অথবা অনুপ্রবেশে সাহায্য করা। কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছা না থাকলেও পরিস্থিতির কারণে এসব করতে হয়। নয়তো অন্য কোনও অভিযোগে ওই জওয়ানকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। যেমন সীমান্ত সংলগ্ন কোনও বাড়িতে ঢুকে মদ্যপ অবস্থায় ভাঙচুর বা লুটপাট অথবা মহিলাদের শ্লীলতাহানি ইত্যাদি। পরিস্থিতি অনেক সময় এমন হয়, মনে হয় আমরা অন্য কোনও দেশ থেকে এসে সীমানা পাহারা দিচ্ছি। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে প্রকৃতি নয়, মানুষ।

> **“ সমস্যা হয় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত যেখানে একটি গ্রামকে দ্বিখন্ডিত করেছে অথবা গা ঘেসাঘেসি করে থাকা দুটি গ্রামকে আলাদা করেছে। নিয়ম মেনে বেড়া দিতে গেলে গোটাগ্রাম বেড়ার ওপারে পড়ে যায় অথবা সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত না থাকায়, বেড়া দেওয়াই সম্ভব হয়নি, অথবা অপরিকল্পিতভাবে জোর করে দেশ ভাগ করার ফলে ভারতীয় সীমারেখা এমনভাবে সরু হয়ে বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে আছে যে বেড়া দিয়ে সেই অংশ ঘিরে ফেলা প্রায় অসম্ভব। আর এসব স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকাই স্মাগলার, চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য। ”**

আবার সীমান্ত ঘেষা কুমারগঞ্জ থানার রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের প্রায় ৭০ বছর বয়স্ক মহেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কাঁটাতারের বেড়া হওয়ায় রাতে অন্তত নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায়। হাত দিয়ে বাংলাদেশের একটি গ্রাম দেখিয়ে জানালেন, বেড়া না থাকার সময় ওই গ্রাম থেকে প্রায়ই ডাকাতরা এসে হামলা করতো। রাত জেগে বন্দুক হাতে নিয়ে পাহারা দিতে হতো। এখন আর তা হয় না। তাই বেড়া হওয়ায় গ্রামবাসী খুশী। বেড়ার ওপারে বাংলাদেশের গ্রামগুলিও বেশ দূরে। মাঝে ফাঁকা মাঠ। বেড়া হওয়ায় এসব গ্রামেরও যেমন কোনও অসুবিধা হয় না, তেমনি বি এস এফ জওয়ানদেরও প্রহরায় অনেক সুবিধা হয়।

সমস্যা হয় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত যেখানে একটি গ্রামকে দ্বিখন্ডিত করেছে অথবা গা ঘেসাঘেসি করে থাকা দুটি গ্রামকে আলাদা করেছে। নিয়ম মেনে বেড়া দিতে গেলে গোটাগ্রাম বেড়ার ওপারে পড়ে যায় অথবা সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত না থাকায়, বেড়া দেওয়াই সম্ভব হয়নি, অথবা অপরিকল্পিতভাবে জোর করে দেশ ভাগ করার ফলে ভারতীয় সীমারেখা এমনভাবে সরু হয়ে বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে আছে যে বেড়া দিয়ে সেই অংশ ঘিরে ফেলা প্রায় অসম্ভব। আর এসব স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকাই স্মাগলার, চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য। এলাকাটি যদি মুসলমান অধ্যুষিত হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। হিলি থানার পূর্ব আপ্তুইর গ্রামের উত্তরে সীমান্তের জিরো পয়েন্টে অবস্থিত হাড়িপুকুর এমন একটি গ্রাম। পশ্চিম আপ্তুইর-এ অবস্থিত চৌদ্দ হাত কালীর মেলা প্রাঙ্গনকে ডান হাতে রেখে আরও এগিয়ে গেলে সীমান্ত সড়কের বাঁ দিকে পড়বে ঘাসুরিয়া গ্রাম। প্রহরারত জওয়ানদের জন্য সীমান্ত সড়কের উপরই অস্থায়ী ছাউনি আছে। হিলি থানায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের অন্যান্য অনেক অংশের মতো এই অংশেও বেড়া নেই। তবুও এলাকাটি হিন্দু অধ্যুষিত বলে ততটা স্পর্শকাতর নয়। সীমান্ত সড়ক বরাবর পূর্বদিকে এগিয়ে যেতেই আবার কাঁটা তারের বেড়া শুরু। কিছুটা যাওয়ার পর ডান দিকে আপ্তুই-র বি ও পি-তে (বর্ডার আউটপোস্ট) যাওয়ার রাস্তা। সেটা পেরিয়ে আরও কিছুটা এগোতেই বেড়া শেষ। সামান্য এগিয়েই রাস্তার ডান পাশে বি এস এফ জওয়ানের অস্থায়ী ছাউনি। এখান থেকে উত্তর দিকে তাকালে যে গ্রামটি দেখা যায় সেইটিই ভারতীয় ভূখন্ডের হাড়িপুকুর গ্রাম। আপাতদৃষ্টিতে একটি গ্রাম মনে হলেও সেটি পাশাপাশি অবস্থিত দুটি

গ্রাম। একটি হাড়িপুকুর অন্যটি বাংলাদেশের গ্রাম বাগমারা, যেটি দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর থানায় অবস্থিত। দু'দেশের দুটি গ্রাম কেবল সীমা চিহ্নিত পিলার দ্বারা আলাদা। পূর্বদিকের অংশ ভারতীয় হাড়িপুকুর আর পশ্চিম দিকের অংশ বাংলাদেশে বাগমারা। এই গ্রামেই জিরো পয়েন্টে বাংলাদেশের মসজিদ যার ছাদের বৃষ্টির জল ভারতের মাটিতে পড়ে। যেখানে গিয়ে কেউ বলে না দিলে বোঝাই যায় না ভারত না বাংলাদেশ কোন দেশে আছি। কথা হচ্ছিল মসজিদের ইমাম রেজাউল করিমের সঙ্গে। যার বাড়ি বাগমারা গ্রামে নয়। ওখান থেকে আরও তিন-চার কিমি ভিতরে বাংলাদেশের একটি গ্রামে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যেটা দেখলাম তা হল এখানে ভারত-বাংলাদেশ বলে আলাদা দুটি রাষ্ট্রের কোনও অস্তিত্ব নেই। অবস্থানগত কারণে এমনভাবে সকলে সীমানা পেরিয়ে এপাড় - ওপার করছে যেন একই পাড়ার ওবাড়ি-এবাড়ি যাওয়া আসা। ইমাম সাহেব জানালেন, দু'দেশের মানুষই মসজিদটিতে নামাজ পড়তেন। তবে সম্প্রতি হাড়িপুকুরে ঢুকতেই ডান পাশে একটি মসজিদ নতুন করে হয়েছে। হাড়িপুকুরের লোকেরা এখন সেখানে নামাজ পড়ে। ইতিমধ্যে দুপুরের নামাজের সময় হয়ে গেছে। দেখা গেল এপার থেকে অনেকেই নামাজ পড়তে বাংলাদেশের মসজিদে ঢুকে পরলো। লোকগুলো কোন দেশের চেনার কোনও উপায় নেই। ফেরার পথে ভারতীয় মসজিদের আশেপাশে কাউকে চোখে পড়েনি। বেশ কিছু স্বল্প পরিচিত হিন্দুর সঙ্গে দেখা হল, যারা হিলি বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ওই গ্রামে গেছে, অবশ্যই এপার-ওপার বা অন্য কোনও ব্যবসার কাজে। হাড়িপুকুর গ্রামে কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। সম্প্রতি সীমান্ত সড়কের ধারে পূর্ব আপ্তুইর শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, যেখানে হাড়িপুকুরের ছেলে-মেয়েরা পড়তে আসে বলে গ্রামবাসীরা জানালেন। এই শিশু শিক্ষাকেন্দ্রকে ভিতরে রেখে আবার বেড়া শুরু হয়ে দক্ষিণ দিকে বরাবর হিলি আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের দিকে গেছে। বেড়াহীন সীমান্ত সড়কের অস্থায়ী ছাউনিতে পরিচয় পত্র দেখিয়ে খাতায় সই করে, মূল ভারতীয় ভূখন্ডে আসতে হয় বা

সীমান্তে অবস্থিত গোসাইপুর গ্রামের চার্চ।

মূল ভূখন্ড থেকে হাড়িপুকুর গ্রামে যেতে হয়। প্রহরারত বি এস এফ জওয়ানের কাছে পরিচয় পত্র দেখিয়ে খাতায় সই করে অনেককেই যেতে আসতে দেখলাম যাদের প্রায় সবাই মুসলমান। গোয়েন্দা রিপোর্টে স্পর্শকাতর এই হাড়িপুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে জওয়ানটি জানালেন এই এলাকা ব্যবহার করে অবৈধ অনেক কিছুই দিনের পর দিন ঘটে চলেছে এবং প্রশাসনের উপর মহল ব্যাপারটি অবগতও আছে। কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য কারণে কেউই স্থায়ী সমাধানের কোনও ব্যবস্থা করছেনা। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে তাঁর যুক্তি — হাড়ি পুকুর গ্রামের বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে কাঁটাতারের বেড়ার এপারে ভারতীয় ভূ-খন্ডে পুনর্বাসন দিলে সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া সম্ভব, নয়তো ওই সমস্যা চলতেই থাকবে এবং এলাকাটি ব্যবহার করে ভারত বিরোধী শক্তি ভারতে ঢুকে বড় ধরনের ক্ষতি করার চক্রান্ত চালিয়েই যাবে।

এই ধরনের আরও অনেকগুলি স্পর্শকাতর গ্রাম আছে। এই জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যেগুলি ব্যবহার করে অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাকারবারী, গরু-পাচার, জাল টাকার বিস্তার, সীমান্তে জনচরিত্রের পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যে চুরি-ডাকাতি, বিভিন্ন জেহাদি গোষ্ঠীর কার্যকলাপ নিরন্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সবকিছু জেনে বুঝেও আর সকলের মতো আমরাও যদি চুপ করে থাকি, প্রতিবাদ না করি, জনসচেতনতা না বাড়াই-তবে আমাদের নিজেদেরও পরিস্থিতির শিকার হতে আর বেশি দেরি নেই।

ভেঙে পড়ছে জনসংখ্যার ভারসাম্য

তরুণ কুমার পণ্ডিত

মালদা জেলায় মোট ১৬৩ কিমি বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। জেলার ১৫টি ব্লকের মধ্যে ৭টি ব্লক সীমান্তবর্তী। ব্লকগুলি হল ইংলিশ বাজার, পুরাতন মালদা, হবিবপুর, বামনগোলা, কালিয়াচক — ১,২,৩। মালদা জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম রয়েছে ১৫০টির ওপরে। এর মধ্যে ৩৫ কিমি সীমান্তে এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়নি। কাঁটাতারের বেড়া ও ওপারে বাংলাদেশের দিকে এখনও প্রায় দুই হাজার ভারতীয় মানুষ ৮-১০টি গ্রামে বসবাস করছেন। সীমান্তে স্বীকৃত মাদ্রাসা আছে ২০টি এবং বেসরকারি মাদ্রাসা আছে ২৫-এর মতো। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ৪০ : ৬০ অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যা বেশি। সীমান্তে মসজিদের সংখ্যা ১৭৫টির ওপরে। প্রতিটি মসজিদ থেকে মাইকে আজান দেওয়া হয় দিনে ও রাত্রে মোট ৮-১০ বার। অপরদিকে হিন্দু গ্রামগুলিতে ব্যক্তিগত শিব, মনসা, কালী মন্দির থাকলেও সার্বজনীন মন্দিরের সংখ্যা ৪০-৫০ টির বেশি হবে না। আর দু- একটি ছাড়া কোনও মন্দিরেই মাইক নেই। ইংলিশ বাজার ব্লকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম রয়েছে ৩০টি। এই ব্লকের মহদীপুর গ্রাম সংলগ্ন সীমান্ত দিয়ে

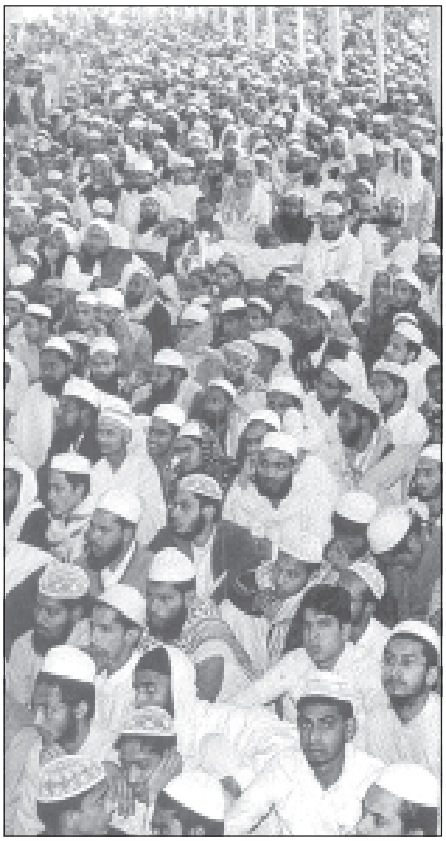

বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানী হয় ও আন্তর্জাতিক বর্ডার হিসাবে চিহ্নিত। মহদীপুর গ্রামটি বেশ বড়। তিনটি আলাদা পাড়া নিয়ে গ্রামটি অবস্থিত। মহদীপুর বাজার পাড়া, কুমোর পাড়া ও মালোপাড়া। এই সীমান্তবর্তী গ্রামে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশ কমছে। আগে এই গ্রামটিতে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৭০ শতাংশ। কিন্তু বর্তমানে হিন্দু জনসংখ্যা হয়েছে ৪৫ শতাংশ। মুসলিম জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৫ শতাংশ। গ্রামটিতে একটি বেসরকারি মাদ্রাসা রয়েছে। হিন্দুরা অনেকেই জমি ও বাড়ি বিক্রি করে শহরে চলে গেছে। সেই জায়গাতে মুসলিমরা বসবাস করছে। মহদীপুরের পাশেই রয়েছে আর একটি গ্রাম — খিরকী। যেটির সকলেই মুসলিম। গ্রামটিতে ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনটি বড় এবং দুটি ছোট মসজিদ রয়েছে এবং এই মসজিদগুলিতে আরব ও ইরান থেকে প্রচুর টাকা আসে বলে খবর। অনেকের দুই দেশেই বাড়ি ও দু'দেশেরই ভোটার হয়ে রয়েছে। এই গ্রাম থেকে এজেন্টরা বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক এনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কাজে নিয়ে যায়। অল্প পয়সায় দরিদ্র বাংলাদেশীদের কাজ পাইয়ে দিয়ে এই গ্রামের অনেকেই ফুলে ফেঁপে

উঠেছে। মহদীপুর বাজারের সংলগ্ন গড়মহলী গ্রামটিতেও খিরকী গ্রামের মতো ৯৯ শতাংশ মুসলিমদের বসবাস এবং বেশির ভাগ মানুষ চোরাকারবারের সাথে যুক্ত। আগে দিনের বেলাতেই প্রচুর গরু পাচার হতো। এখন বর্ডারে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য রাতের বেলাতে কিছু শ্রেণীর বি এস এফ জোয়ানদের টাকা দিয়ে গরু পাচার হয়। এই সব মুসলিম গ্রামগুলিতে প্রচুর বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। এই সীমান্তবর্তী গ্রামের মসজিদের মাইক থেকে আজানের আওয়াজ শব্দ-দূষণের অনেক বেশি জোরে বাজে। মহদীপুর গ্রামে দুটি হাইস্কুল রয়েছে। বয়েজ স্কুলটিতে ৬০ শতাংশ মুসলিম ছাত্র পড়াশুনা করে। এই বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজার সাথে সাথে মৌলভীকে দিয়ে জলসা করানো হয়। সম্প্রতি এই হাইস্কুলে সদ্য চার বছর জেল ফেরৎ সিমির নেতা সামসুদ্দোহাকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোনও প্রমাণ প্রশাসন দিতে না পারায় এই সিমি নেতা বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে। আসলে সি পি এমের শিক্ষক সংগঠন এ বি টি এ-এর বদান্যতায় সে ছাড়া পেয়ে যায়। সীমান্তবর্তী মহদীপুর অঞ্চ লটি এখনও হিন্দু প্রধান রয়েছে। তবে কতদিন হিন্দু প্রধান থাকবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে হিন্দুদের ফসল সুরক্ষিত থাকে না। এই অঞ্চ লে হিন্দুদের একাংশ চোরা কারবারের সাথে যুক্ত। রাজনৈতিক দলগুলি — 'ঘোষ ও মণ্ডল' হিন্দুদের এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডগোল ও মারামারির ফায়দা তুলে থাকে। বামফ্রন্টের সৌজন্যে মদের নেশা এই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে গ্রাস করেছে। সুষ্ঠু মানসিকতা এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের পরিবেশ গ্রামগুলিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ইংলিশ বাজার ব্লকের সীমান্তবর্তী আরও তিনটি গ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত। সেগুলি কাঁটাতারের বেড়ার লাগোয়া মুসলিমপুর, কৃষ্ণপুর এবং কুমারপুর। এই সব গ্রামগুলির বেশিরভাগ সদস্যের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে বাংলাদেশে। এই সীমান্তবর্তী গ্রামের বেশ কিছুটা অংশে এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি, যদিও সম্প্রতি কাজ শুরু হয়েছে। ৬-৭ বছর আগেও দুই দেশের মধ্যে বিয়ের প্রচলন ছিল, কাঁটা তারের বেড়া না থাকার জন্য সহজেই বিয়ে হয়ে যেত এবং যাতায়াত ছিল। একটি বড় মসজিদ রয়েছে মুসলিমপুর গ্রামে। মহদীপুর সীমান্তে যেমন বি এস এফের ক্যাম্প রয়েছে তেমনি মুসলিমপুর, কৃষ্ণপুর ও কুমারপুরেও বি এস এফ ক্যাম্প রয়েছে। এই এলাকার বি এস এফের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলেছেন, এই সব মুসলিম গ্রামগুলিতে অনেকেই চোরাকারবার এমনকী আতঙ্কবাদের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এদের ধরলেই নাকি এম পি আবু হাসান কিংবা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সাবিনা ইসাসামন কিংবা পঞ্চ ায়েত সমিতির সভাপতি এক্রাম হোসেনের ফোন আসে — ধৃত ব্যক্তি নির্দোষ, তাকে ছেড়ে দিন। এই ইংলিশ বাজার ব্লকের সীমান্তবর্তী জমিগুলি বেশির ভাগই মুসলিমদের হাতে চলে গেছে। সুজাপুর থেকে প্রচুর টাকা দিয়ে সীমান্তবর্তী জমিগুলি হিন্দুদের হাত থেকে কিনে নিচ্ছে তারা। মধুপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চ ায়েতের প্রধান মুসলিম হওয়ায় এই সব গ্রামগুলিতে বাংলাদেশী সিম কার্ড ব্যবহারও বাড়ছে। ইংলিশ বাজার ব্লকের মহদীপুর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বর্ডার হিসাবে চিহ্নিত হলেও বেশ কিছু জঙ্গি এই বর্ডার দিয়ে পার হয়েছিল এবং আর ডি এক্স-এর মতো বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া গিয়েছিল। অস্ত্র পাচার ও নারী পাচার চক্রও এখানে সক্রিয় ছিল। তবে মালদা জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা থাকার জন্য হিন্দুরা অনেকটা নিরাপদে বসবাস করতে পারে। সঙ্ঘের

স্বয়ংসেবকরা বি এস এফের সহযোগিতায় বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে এবং চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ রুখে দেয়। ইংলিশ বাজার ব্লকের এমনই একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম কাঞ্চ নতার যেখানে স্বয়ংসেবকদের প্রচেষ্টায় আজ পর্যন্ত কোনওদিন গরু পাচার বা চোরাচালান হয়নি। সঙ্ঘের শাখা থাকার জন্য অনুপ্রবেশও তেমন হতে পারে না। অন্য সীমান্ত যেমন হিন্দুরা অনেকেই শহরে চলে গেছে মুসলিমদের কাছে জমি বিক্রি করে তেমন এখানে হয়নি। পাশেই মুসলিম গ্রাম নরেন্দ্রপুর থাকলেও তারা সংগঠিত এবং সাহসী হিন্দু শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করেই চলে। মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই কাঞ্চ নতার একটি মাত্র গ্রাম, যেখানে একটিও মুসলিম নেই অথচ একটি মসজিদ রয়েছে (মাইক নেই বা আজান পড়ে না) এবং পাশের গ্রাম থেকে প্রতি শুক্রবার তারা নমাজ পড়তে আসে। এখানে দুই এক জন বালক মুসলিম স্বয়ংসেবক শাখাতে আসে। তারা ভারতমাতা কী জয় বলে প্রার্থনা করে।

বামনগোলা ব্লকের খুটাদহ শোনঘাট প্রভৃতি গ্রামগুলির বেশ কিছু মানুষ এখনও কাঁটাতারের ওপারে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কিছু মানুষ কাঁটাতারের ওপারে থাকতে না পেরে এপারে প্রতিবেশীদের বাড়িতে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছে। হবিপুর ব্লকের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে জনজাতি সাঁওতালদের খৃস্টান মিশনারীরা ধর্মান্তরিত করেছে এবং এই ব্লকেই বেশ কয়েকটি চার্চ রয়েছে। এই গ্রামগুলি থেকেই মিশনারীরা কিছুদিন আগে জনজাতি মহিলাদের কাজের লোভ দেখিয়ে বিক্রি করার মতলব করেছিল এবং পরে মিশনারীদের লোক ধরাও পরে। এই ব্লকের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির সমস্যা বাংলাদেশী ডাকাতরা গ্রামগুলি থেকে গরু চুরি করে নিয়ে যায়, কাঁটাতারের ওপারের ফসল বাংলাদেশীরা কেটে নিয়ে যায়। সারা মালদা জুড়ে সীমান্তের ওপারে হাজার হাজার বিঘে ভারতীয় জমি কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে পতিত পরে থাকে। ফলে গ্রামগুলির মানুষের জমি থেকেও দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে বেঁচেথাকছে। কালিয়াচক ব্লকগুলির মধ্যে চরিয়ানন্তপুর, দুইশত বিঘি গুলদেবপুর, গোলাপগঞ্জ, আকন্দবাড়িয়া, কুম্ভিরা, সবদলপুর গ্রামগুলির বেশ কিছু পাড়া কাঁটাতারের ওপারে রয়েছে। তারা ভিটে মাটি ছেড়ে নতুন করে জমি কিনতে না পারার জন্য ওপারেই থাকতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ বি এস এফ দিনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাঁটা তারের বেড়ার গেট খোলে। ফলে যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা এপারে স্কুলে পড়াশুনা করতে আসে, কিংবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলে ওপারের বাসিন্দারা বিপদের মধ্যে পড়ে। রাতের বেলাতে গেট সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় ভারতীয়রা নিজভূমিতে পরবাসীর মতো নিরাপত্তার অভাবে ভুগতে থাকে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় কখন গেট খুলবে। আর কাঁটা তারের ওপারে হাজার হাজার বিঘে জমি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির মানুষদের পতিত পরে থাকে নিরাপত্তার অভাবে। কলিয়াচকের সীমান্তবর্তী মুসলিম গ্রামগুলিতে বেআইনী অস্ত্রের ও বিস্ফোরক পদার্থের মজুত ভাণ্ডার রয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এই খবর কিছুদিন আগেই দিয়েছে। মাদ্রাসা ও মসজিদের সংখ্যা এই কালিয়াচকে ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বৈষ্ণবনগরের শ্রীকৃষ্ণপুর পুরচাসা গ্রামে ১০-১২ বছর আগে ১০০-এর উপরে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী দশ-বারোটি পরিবার এসে বসেছিল। একথা প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। বর্তমানে মুসলিম গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের সাহায্যে রেশন কার্ড ও ভোটার লিস্টে নাম তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই কালিয়াচকের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বাংলাদেশী ছাত্ররা মাদ্রাসাতে ভর্তি হয়ে পরবর্তীকালে ভারতের নাগরিক হয়ে যাচ্ছে। কালিয়াচক ব্লকের বিভিন্ন গ্রামেও মুসলিম জনসংখ্যা ৬০ শতাংশ হয়ে গেছে। বেশিরভাগ জমি এখানেও মুসলিমদের হাতে চলে গেছে। বাখরাবাদ অঞ্চলের শুখনগরে গ্রাম থেকেও অর্থবান হিন্দুরা শহরে চলে গেছে ও মুসলিমরা সেই জমি নিয়েছে। এইসব মুসলিমবহুল গ্রামগুলিতে জাল নোট তৈরির কারখানা থাকা অস্বাভাবিক নয়, কেননা কালিয়াচক থেকেই প্রচুর জাল নোট পুলিশ উদ্ধার করেছে। সীমান্তবর্তী এইসব মুসলিম গ্রামগুলির মসজিদ থেকে যে মাইকে আজান দেওয়া হয় তা বাংলাদেশের আজান দেওয়ার পর দেওয়া হয়। কালিয়াচকে বেশ কিছু মাদ্রাসা সংলগ্ন এন জিও আছে যেগুলিতে জঙ্গি কার্যকলাপ চলে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে। সব মিলিয়ে মালদা জেলার সীমান্তের গ্রামগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে সীমান্ত সুরক্ষার দিক থেকে আগামী দিনে সবাইকে চিন্তার মধ্যে ফেলবে বলে অনেকেই মনে করছেন। তবে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ভারসায় হিন্দুরা মনোবল ও শক্তি অনেকাংশে ফিরে পাচ্ছে।

ইংলিশ বাজার ব্লকের এমনই একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম কাঞ্চ নতার, যেখানে স্বয়ংসেবকদের প্রচেষ্টায় আজ পর্যন্ত কোনওদিন গরু পাচার বা চোরাচালান হয়নি। সঙ্ঘের শাখা থাকার জন্য অনুপ্রবেশও তেমন হতে পারে না। অন্য সীমান্ত যেমন হিন্দুরা অনেকেই শহরে চলে গেছে মুসলিমদের কাছে জমি বিক্রি করে তেমন এখানে হয়নি। পাশেই মুসলিম গ্রাম নরেন্দ্রপুর থাকলেও তারা সংগঠিত এবং সাহসী হিন্দু শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করেই চলে।

চোরাঘাতগুলিই পাচারের কেন্দ্র

সন্তোষ সরকার

মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকা দিয়ে চলে অবাধে পাচার। কী নেই তার মধ্যে? পাচারকারীদের রপ্তানি তালিকায় রয়েছে গরু, চিনি, লবন, চাল, ডাল থেকে বিভিন্ন আনাজ। শুধু তাই নয়, রয়েছে কাপড়, সাবান, বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী। মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত এলাকার মধ্যে পদ্মানদীও পড়ে। এই নদী পেরিয়ে ওপাড় থেকে এদেশে ঢোকে অনুপ্রবেশকারীরা। তাছাড়া প্রতিবছর গঙ্গা পদ্মার ভাঙনে মুর্শিদাবাদ জেলার ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তন হচ্ছে। লালগোলা ও জঙ্গিপুরের কয়েকটি গ্রাম পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ভাঙনে সীমান্তে কোথাও দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে, আবার কোথাও দূরত্ব কমে গিয়েছে। এখন আউট পোস্টের থেকে পদ্মার দূরত্ব ৭০ থেকে ৭৫ মিটার। লালগোলায় দেড় কিলোমিটার আরক্ষিত জলপথ। এখান দিয়ে পাচার কার্য চলে। লালগোলায় পদ্মার ওপরে দু কিলোমিটার দূরে চরে ৬০০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে নারুখালি চর। এই চরে গড়ে ওঠা হঠাৎপাড়া, নারুখালি, জ্যোতি বিশ্বনাথপুর ও চারারেকাট্টা — এই চারটি গ্রামে প্রায় ৩৫০ টি পরিবার বাস করেন। এই চর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা। ফলে পদ্মা পেরিয়ে সীমান্ত ঘেষা গ্রামে ঢুকে পড়া চলছে। তাছাড়া লালাগোলায় বিভিন্ন ঘাট দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে অবাধে চোরাচালান চলে। লালগোলার দশ থেকে বারোটি ঘাট দিয়েই মূলত এই মাল পাচার হয়। এছাড়াও রয়েছে স্থানীয় ভাষায় 'চোরাঘাট' হিসেবে পরিচিত ছোট বড় বেশ কয়েকটি ঘাট। এই ঘাটগুলো দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে যেমন মাল পাচার হয়, তেমনই বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে মানুষ আসে। দেশোয়ালি পাড়া, ক্লাবভাট, পুরপুলিতলাসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরলে দেখা যাবে ছেলে-মেয়ে থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই নিশ্চিন্তে সীমান্ত পারাপার করছে। লালগোলায় কাটা খালি, কৃষ্ণমাল, রামনগর, তারানগর, গাবতলা, পুরপুলিতলা দিয়ে মাল পাচার হয়।

চোরাঘাট দিয়ে মাল পাচার হচ্ছে।

জেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের ঘটনা ক্রমশ বাড়তে থাকায়, ফরাক্কা নওদা থেকে শুরু করে জলঙ্গী, রঘুনাথগঞ্জের চাষীরা উদ্বিগ্ন। তাদের আশঙ্কা যে হারে গরু পাচার হচ্ছে তাতে গো-প্রজাতি শেষের পথে। বেলডাঙার হাটে প্রতি মঙ্গলবার দু-তিন হাজার গরু আসে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে কারা এত

গরু কেনাবেচা করে তা তাদের কাছেও স্পষ্ট নয়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে মোটামুটি ৮টি গরু হাট বসে। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে হরিহর পাড়া, বেলডাঙা, ডোমকল, গোবিন্দপুর, সাগরদিঘি, বড়এঞার ডাকবাংলো, ওমরপুর এবং জলঙ্গীতে গরুর হাট বসে। তার মধ্যে ডোমকল, গোবিন্দপুর, জলঙ্গীর গরুর হাটগুলো বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ১০ থেকে ১২ কিমি দূরে। জেলা প্রশাসনের মতে হরিহরপাড়া হল গরু পাচার চক্রের প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে তিনটি পথে বাংলাদেশে গরু পাচার হয়ে থাকে। একটি হল স্বরূপপুর ঘাট, একটি ভগীরথপুর ঘাট আর অন্যটি রামপাড়ার ভান্ডারদুয়ার ঘাট। এই তিনটি ঘাট দিয়ে বড় বড় নৌকো করে গরু পাচার হয়ে যায়। এই এলাকায় হিন্দুর বাস কম নয়, তবুও তাঁরা ভয়ে কিছু বলতে সাহস পান না। কারণ প্রশাসন এবং রাজনৈতিক

ফারাক্কা ব্লক

গ্রামের নাম	মন্দির	মসজিদ	মাদ্রাসা	হিন্দু শতকরা	মুসলমান শতকরা
পারদেওানাপুরচর	২	২	—	৫০	৫০
ধুলিয়ান (সামসেরগঞ্জ ব্লক)	৪	১২	৫	৩০	৭০
লালগোলা (লালগোলা ব্লক)	৫	২০	৬	২০	৮০
নির্মলচর (ভগবানগোলা ব্লক)	—	—	—	২০	৮০

দল — সবাইয়ের সংখ্যালঘুদের জন্য প্রাণ কাঁদে।

গত বছরের নভেম্বরেই জলঙ্গীথানার কাজীপাড়া গ্রামে বিবেকানন্দ শিশু বিদ্যা মন্দির প্রাঙ্গণে হঠাৎ কয়েক'শো মুসলমান এসে নামাজ পড়তে শুরু করে। পরে রাত্রিতে বাঁশ টিন সংগ্রহ করে মসজিদ তৈরির প্রস্তুতিও নেয় তারা। স্থানীয় হিন্দু জনগণ পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি জানালেও প্রশাসনের ভূমিকা ছিল নীরব। শুধু তাই নয়, মুসলিম দুস্কৃতীরা হিন্দুদের বাড়িতে বেছে বেছে লুট চালায়। মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করতেও তারাও পিছপা হয় না। সীমান্ত এলাকার সর্বত্র একই অবস্থা। রামচন্দ্রপুর, তুরা, কাঁটাবাড়ি, ধনীরামপুর, বালিবোজা প্রমুখ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির হিন্দুদের একপ্রকার ভয় দেখিয়ে এলাকাছাড়া করার ব্যবস্থা চলছে। আর এই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে চলছে মুসলিম জঙ্গিদের আনাগোনা। সীমান্ত অতিক্রম করার সময় বি এস এফ-এর হাতে ধরা পড়লেও, সীমান্তবর্তী মুসলিম গ্রামগুলিই মুসলমান উগ্রপন্থীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

ব্লক রানীনগর - ২নং

গ্রামের নাম	মন্দির	মসজিদ	মাদ্রাসা	হিন্দু শতকরা	মুসলমান শতকরা
বামনাবাদ	১	৩	—	৩০	৭০
চরমুন্সীপাড়া	১	—	—	৫০	৪০
বাজাপুর	১	২	—	৪০	৬০
মালোপাড়া	—	১	—	৩০	৭০
মহোনগঞ্জ	২	১	—	৫০	৫০
কাতলামারী	১	২	—	৩০	৭০
কাহার পাড়া	১	২	—	৩০	৭০
দুর্গাপুর	১	—	—	৭০	৩০
হারুভাঙ্গা	১	—	—	৮০	২০
শিবনগর বর্ডারপাড়া	১	২	—	৩০	৭০
রামনগর	—	৪	১	৩০	৭০

জলঙ্গী ব্লক

গ্রামের নাম	মন্দির	মসজিদ	মাদ্রাসা	হিন্দু শতকরা	মুসলমান শতকরা
ধনিরামপুর	১	৪	১	২০	৮০
সাহেব নগর	১	৪	১	৫	৯৫
সাগর পাড়া	৫	৪	—	৩০	৪০
সিং পাড়া	২	১	—	৮০	২০
দয়রামপুর	৩	৩	—	৩০	৭০
কে মথুরা	১	১	—	৪০	৬০
ঘোষ পাড়া	—	৭	—	১০	৯০
চুয়াপাড়া	২	৩	—	৪০	৬০
সরকারপাড়া	১	৪	—	৮০	২০
কাটা বাড়ি	২	১০	১	১০	৯০
দেবীপুর	২	—	—	৮০	২০
পোল্লাগড়া	২	৩	—	৫০	৫০
জলঙ্গী মেন	৩	৪	—	৩০	৭০

পরিকল্পনা মাফিক গ্রামগুলি হিন্দু শূন্য করা হচ্ছে

রবিকিঙ্কর ঘোষ

চাপড়া থানায় বেছে বেছে প্রতিবাদী হিন্দু যুবকদের খুন করা হচ্ছে। ....ছক কষে হিন্দুদের বাড়িতে ডাকাতি করা হচ্ছে। দুই বাংলার মুসলমান ডাকাত এতে থাকে। বাংলাদেশ থেকে চার-পাঁচজনের দল কাঁটাতার পেরিয়ে এপারে এসে মুসলিমদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। একটি দলে আট-দশজন থাকে। লুটপাট চুকিয়ে আবার ফিরে যায় বাংলাদেশে।

নদীয়া জেলায় সাতটি ব্লকে প্রায় ১৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে অনেকটা অংশে। চেক পোস্টও আছে। কিন্তু হাজার হাজার একর জমি কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থেকে যাচ্ছে। ফলে চাষীরা ফসল পাচ্ছে না। চাপড়া থানার হাটখোলা গ্রামের বাসিন্দারা যেন স্বদেশে থেকেও পরবাসী। ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ড নিয়েও হিন্দুরা যেন ভারতীয় নয়। কাঁটাতারের গেট খোলা-বন্ধ বি এস এফের হাতে। মানুষের বিশেষত চাষীদের হয়রানির শেষ নাই। তেহট্ট, করমিপুর, হাঁসখালি, বার্নপুর — সর্বত্রই একই চিত্র।

দেশভাগের আগে নদীয়া জেলার আয়তন ছিল ৮৯২৭ বর্গ কিলোমিটার। এখন তা কমে অর্ধেক হয়েছে — ৩৯২৭ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৪৬ লক্ষ ৪০ হাজার ৮২৭ জন। হিন্দু ৭৩.৭৫ ও মুসলিম ২৫.৪১ শতাংশ (২০০১-এর জনগণনা)। মুসলিম জনসংখ্যা এই জেলায় ৭.১৪ শতাংশ হারে বেড়েছে। অন্যদিকে হিন্দুদের সংখ্যা তো বাড়েইনি, বরং ৭.০৪ শতাংশ হারে কমেছে। জেলায় শহরের সংখ্যা ১০ এবং গ্রামসংখ্যা ১৪৮৬। পঞ্চায়েত আছে ১৮৭টি, থানা ২১টি। লোকসভার আসন সংখ্যা ২টি, বিধানসভা ১৫টি।

হিন্দুপ্রধান জেলা হলেও চাপড়া ব্লকে ৬০ শতাংশ মুসলমান। কালিগঞ্জ ও নাকাশিপাড়া থানায় এই অনুপাত ৫০ : ৫০। থানার পাড়া থানাতে ৯০ শতাংশই মুসলিম। অপারেশন পিনকোড পরিকল্পনার মাধ্যমে যেখানে মসজিদ ছিল না সেখানে মসজিদ

ফঃ ৫

হয়েছে। আর যে গ্রামে মসজিদ ছিল, তা নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। বহু মসজিদের আধুনীকিকরণ হয়েছে। প্রতি মসজিদে মৌলভী রাখা হয়েছে। মৌলভীর ভরণ-পোষণ গ্রামের মুসলমানরাই করে থাকে। মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, সাত বছর বয়সের সমস্ত ছেলেদের মসজিদ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সীমান্তের গ্রামগুলি ক্রমশ হিন্দু শূন্য হচ্ছে এবং তা পরিকল্পনা মাফিকই। সীমান্তের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে যে কোনও একটি গ্রামকে ঠিক করা হয়। ওই গ্রামের কোনও প্রভাবশালী পরিবারের মেয়ে যখন স্কুলে যায়, তাকে ঠাট্টা করে। এতে কাজ না হলে হাত ধরে টানে। মেয়ে একথা বাড়িতে জানালে চতুর অভিভাবক বাড়ি বিক্রি করে হিন্দু প্রধান এলাকা বা শহরে পালায়। এতে মুসলমানরা জয়ের স্বাদ পায়। শুরু হয় অত্যাচার। শান্তিপ্রিয় হিন্দুরা প্রতিবাদ না করে অল্প দামে মুসলমানদের বাড়ি জমি বিক্রি করে গ্রাম ত্যাগ করে। এভাবে গ্রাম হিন্দু শূন্য করার প্রক্রিয়া করিমপুর ও চাপড়া থানায় সব থেকে বেশি। কালিগঞ্জ ও নাকাশিপাড়া থানায় গ্রাম হিন্দু শূন্য করার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই নদীয়ার বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট সীমান্ত এলাকায় ১৫০টি গ্রাম হিন্দু শূন্য হয়েছে। এসব দেখেশুনেও জেলার হিন্দুরা চুপ করে আছে। এরই পাশাপাশি মুসলিমদের সংখ্যা বাড়িয়ে নদীয়া জেলাকে বৃহত্তর বাংলাদেশ-এর আওতায় আনার ছক কষা হয়েছে। প্রত্যেক মুসমিল দম্পতিকে ১০ থেকে ১২ টি বাচ্চার জন্ম দিতে বলা হচ্ছে। সেইসঙ্গে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও তালাক প্রথার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। একজন মুসলিম দিনমজুর বা রিক্সাওয়ালার দশ-বারোটি করে ছেলেমেয়ে। আল্লার প্রতি অগাধ বিশ্বাসই এই সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক। অন্যদিকে প্রতি গ্রামে হিন্দুদের মধ্যে গড়ে ৮ থেকে ১২ জন পুরুষ এবং ৪-৫ জন মহিলা অবিবাহিত থাকে। চাপড়া থানায় বেছে বেছে প্রতিবাদী হিন্দু যুবকদের খুন করা হচ্ছে। ২০০৮ সাল রতন ঘোষ-এর মৃত্যু তার উদাহরণ। গত দশ বছরে এভাবে নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৫০ জন।

বাংলাদেশ থেকে হুজি, সিমি, মুজাহিদ্দিন, দার উল উলুম, দেওবন্দ প্রভৃতি সংগঠনের নেতারা সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে আসা-যাওয়া করছে। পলাশী, নাগাদী, হাটখোলা, তেঁতুলবেড়িয়া, পাথরঘাটা, সোনাডাঙ্গা, রুকুনপুর, বিলকুমারী, হরনগর, আড়বেতাই, শিমুরালী, মোল্লাবেলিয়া, কাষ্ঠডাঙ্গা, কুচাইডাঙ্গা, কালুপুর, নবীনগর, ফাজিলনগর এলাকায় তালিবানপন্থী ও জেহাদিদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। তবে চাপড়া থানাতেই জেহাদি জঙ্গি তৈরির কারখানা বেশি।

সীমান্তের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে যে কোনও একটি গ্রামকে ঠিক করা হয়। ওই গ্রামের কোনও প্রভাবশালী পরিবারের মেয়ে যখন স্কুলে যায়, তাকে ঠাট্টা করে। এতে কাজ না হলে হাত ধরে টানে। মেয়ে একথা বাড়িতে জানালে চতুর অভিভাবক বাড়ি বিক্রি করে হিন্দু প্রধান এলাকা বা শহরে পালায়।

সীমান্তের রাউতোরা, পাথঘাটা, বালিউড়া, লক্ষ্মীগাছা, চুপিপোতা, চুপাড়িয়া, শান্তিপুর, হরিপুর, মায়াপুর, বাগদিয়া, বাগআচরা, পাইকসা, বড় চাঁদঘর প্রভৃতি গ্রামগুলিতে সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে দুস্কৃতীদের যাতায়াত আছে। ছক কষে হিন্দুদের বাড়িতে ডাকাতি করা হচ্ছে। দুই বাংলার মুসলমান ডাকাত এতে থাকে। বাংলাদেশ থেকে চার-পাঁচজনের দল কাঁটাতার পেরিয়ে এপারে এসে মুসলিমদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। একটি দলে আট-দশজন থাকে। লুটপাট চুকিয়ে আবার ফিরে যায় বাংলাদেশে। এক রাতে প্রায় ১০-১৫টি হিন্দু বাড়িতে ডাকাতি হয়। সন্ধ্যে সাতটা থেকে হামলা চলে। বোমা, আধুনিক রাইফেল, ভোজালি নিয়ে ডাকাতি করতে আসে। পরনে থাকে হাফ প্যান্ট, মাথায় পাগড়ী অথবা টুপি, কেউ কেউ মুখোশ পরে থাকে। বয়স ১৮ থেকে ২৪-এর মধ্যে। প্রথমে প্রচন্ড মরাধোর করে, ভোজালির কোপ মারে, চাবি না দিলে অত্যাচার চালায়। মেয়েদের ধর্ষণ করে। সুন্দরী মেয়ে-বউদের প্রতি অত্যাচার বেশি হয়। এমন কিছু বাড়ি আছে যেখানে দশ-বারোবার ডাকাতি হয়েছে। পুলিশ সব জেনেও নিষ্ক্রিয়। বিএসএফ-এর কোনও ভূমিকা নেই। বড় অপরেশনে (ডাকাতি) টাকার চুক্তি হয়। রাস্তা চেনা না থাকার জন্য অনেক সময় বাংলাদেশী ডাকাত গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে মারাও যায়। খবর সংগ্রহ করে বিয়ের আগের রাতে ডাকাতি বেশি হয়।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন প্রজাতির গরু নদীয়া জেলার সীমান্ত চেক পোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। করিমপুর হয়ে শিকারপুর, গান্ধীনা, ব্রজনাথপুর, পাইকসা, চাতানিয়া, হোগলবেড়িয়া বর্ডার দিয়ে দালাল চক্রের মাধ্যমে গরু পাচার হয়। প্রতিটি গরু পিছু বি এস এফ ক্যাম্পে দালালরা ২৫০০-৩০০০ টাকা দেয়। টাকা নিয়ে চুক্তি ভঙ্গ হলে দু'একজন সেখ ভাই বি এস এফের গুলিতে মারা যায়। বাইরের যোগান কম হলে সীমান্তে হিন্দুদের বাড়ি থেকে জোর করে গরু চুরি করা হয়। পুলিশকে জানিয়েও কোনও ফল হয় না।

গরু হিন্দুদের শ্রদ্ধার কেন্দ্র। তাই হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার জন্য বেশি সংখ্যায় গোহত্যা করা হচ্ছে এবং তা প্রকাশ্যেই। বিভিন্ন সময়ে জলসা-র নামে রাস্তার ধারে গো-হত্যা চলে। ২০০৮ সালে হাঁসখালি ব্লকের রামনগর গ্রামে একদিনে ৭৫টি গো-হত্যা করা হয়। যে সমস্ত গ্রামে কুরবানী হোত না, এখন সেখানে জোর করে

কুরবানি করানো হচ্ছে। পলাশী, চাপড়া, রুকনপুর, সোনাডাঙ্গা, তেঁতুলবেড়িয়া, চুপরিয়া, পাইকসা গোহত্যার মূল কেন্দ্র।

পলাশী, নাগাদী ও চাপড়া এলাকায় প্রায় রোজই পুলিশ জাল নোট কারবারীদের ধরছে। চাকদা, রানাঘাট, শিমুরালী ও কৃষ্ণনগরে এই চক্র খুবই সক্রিয়। সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশী ও চীনা জিনিসে বাজার ছেয়ে গেছে। প্রচুর কম দামে শীতবস্ত্র আসছে বাংলাদেশ সংলগ্ন নদীয়া সীমান্ত দিয়ে। এমনকী প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সরকার অনুমোদিত গাড়িতেও মালপত্রের সঙ্গে চলে আসছে জাল নোট।

চাপড়া, করিমপুর, তেহট্ট, পলাশী এলাকা থেকে আফিং, গাঁজা, তামাকজাত দ্রব্য যাচ্ছে বাংলাদেশে। বিনিময়ে এদেশে আসছে পাইপগান, মাসকেট, চীনা পিস্তল, একে-৪৭, এস এল আর এবং বোমার মসলাসহ বিস্ফোরক পদার্থ। ঝাঁটার বান্ডিল, কাপড়ের গাঁট, রাসায়নিক সারের বস্তার ভেতরে আসছে অস্ত্র, বিস্ফোরক পদার্থ। বিভিন্ন মাদ্রাসার মাধ্যমে অস্ত্র পৌঁছে যায় দালালদের হাতে। তারা লোকাল মার্কেট-এ সেগুলি মোটা টাকায় বিক্রি করে। এইসব আগ্নেয়াস্ত্র মুর্শিদাবাদ, নলহাটি, রামপুরহাট, মহম্মদবাজার, ইলামবাজার, আসানসোল, বর্ধমান, মেমারি ও কলকাতা হয়ে অন্য রাজ্যে যায়। এই পথ 'কলকাতা করিডোর' নামে চিহ্নিত।

সব চেকপোস্টে একই রকম কাজ হয় না। কোথাও পাসপোর্ট, কোথাও বিদেশে লোক পাঠানো, কোথাও চোরাই মদ ও ড্রাগ, কোথাও সার-চিনি-লবন, কোথাও জাল নোট, কোথাও আফিং বা গরুপাচার, কোথাও অস্ত্রসামগ্রী, কোথাও বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ। বিভিন্ন রকমের দালাল চক্র আছে। প্রতিটি দলেরই আলাদা আলাদা 'বস' আছে। এইসব কাজে হিন্দু মুসলমান উভয়েই জড়িত। তবে সব পোস্টেই মূল পাণ্ডা মুসলমান। বাংলাদেশের সীমান্তেও ঠিক একইভাবে কাজ চলে। মোবাইল চক্র খুব সক্রিয়। দালালদের দাবি মতো টাকা মেটালেই কাজ হাসিল। টাকার ভাগ পার্টি, পুলিশ, বি এস এফ — প্রত্যেকেই পায়। সীমান্ত এলাকায় বহু মানুষই এইভাবে বেকারত্বের জ্বালা মেটায়।

সীমান্ত এলাকায় একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করার জন্য একটা চক্র জেহাদের ক্যাসেট, সিডি চালিয়ে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করে। বাধা দিলে মারধর করা বা গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। হিন্দু দেব-দেবীদের সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলা, হিন্দুদের পূজা-পার্বনে বাঁধা দেওয়া হয়। হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়। হিন্দু পাড়ার মধ্য দিয়ে তাজিয়া নিয়ে যাওয়া হয়। মাঠে যদি পাশাপাশি হিন্দুর জমি থাকে, ইচ্ছে করে বেশি আল কেটে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়ে হিন্দু চাষী কোনও বিচার পায় না। হাটে-বাজারেও একই চিত্র। অত্যাচার সহ্য করতে করতে বিরক্ত হয়ে পালিয়ে আসে হিন্দুপ্রধান এলাকায়।

অনুপ্রবেশ নিয়ে যখন সংসদে হইচই হয়, তখন সরকারি অভিযান চালিয়ে হিন্দু শরণার্থীদের গ্রেপ্তার করা হয়। থানা তাদের বিরুদ্ধে কেস দেয় বা ওপারে পাঠায়। তখন বিডি আর তাদের গুলি করে মারে, হিন্দুরা দু'দিক থেকেই বঞ্চিত হয়।

বনগাঁ সীমান্তের কড়চা

সত্যানন্দ গুহ

পৃথিবীর বড় বড় শহর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে। সিন্ধু সরস্বতী গঙ্গা ধারাতেই ভারতবর্ষের সভ্যতার আদিপর্ব গড়ে উঠেছিল।

সীমান্ত শহর বনগ্রামকে ইচ্ছামতী নদী সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। আজ বনগ্রামে পা রাখলেই চোখে পড়ে যশোর রোডের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা। গতিহীন যানজটে আক্রান্ত শহরের রাস্তাঘাট এবং মজা নদী ইচ্ছামতীর কচুরিপানায় স্রোতহীন বৈধব্যদশা। বন্যা আতঙ্ক আজও বনগাঁবাসীদের তাড়া করছে। মাজদিয়া থেকে বাদুড়িয়া পর্যন্ত নদীর চড়ে কচু চাষ, ধান চাষ ও শাক-সব্জী চাষ হয়। আর সামর্থ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়ান ইঁটভাটা, পাকাবাড়ি, টালির চুল্লি মাথা উঁচু করে রয়েছে।

ইচ্ছামতীর ওপর রাখাল দাস ব্রীজ যশোরের সঙ্গে সংযুক্ত করলেও সন্ধ্যার পর মানুষজন ঘর বন্দী হন। চলে মস্তান ও রাজনৈতিক দলের হিরোদের রাজত্ব। এককালে বনগাঁ যশোরের অংশ ছিল। যশোরকে ভারত বিভাগে পূর্ববঙ্গকে উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল। ফলে বৃহত্তর যশোরের বহু নাগরিক অবৈধভাবে ভারত ভূখণ্ডে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য, চুরি-ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, নারীপাচার, গরুপাচার করছে। ৯০ ভাগ এভাবে দুই বঙ্গের রস চুষে পুষ্ট হচ্ছে। আর ১০ ভাগ বৈধভাবে অর্থাৎ পাসপোর্ট ভিসা করে বাসে বা হাঁটাপথে এদেশে আসে। অন্যরা রাতে নদী পেরিয়ে বা কাঁটাতার ডিঙিয়ে এপারে আসে।

এদেশে আসার জন্য কেউ কেউ দালালেরও সাহায্য নেয়। তবে বাংলাদেশ থেকে উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে চোরাপথে এদেশে আসতে হলে যোগাযোগ করতে হবে এই দালালদের সঙ্গে। এভাবেই বাংলাদেশ থেকে লোক আসছে। বাংলাদেশ থেকে লোকপাচার করার ব্যবস্থা বেশ চালু। এজন্য দালালেরা সবাই মিলে একটি সিন্ডিকেটও বানিয়েছে — যার নাম 'ধুর সিন্ডিকেট'। চোরাপথে যারাই দু'দেশের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে, তাদের কোড চিহ্ন বহন করে এই শব্দটি। ধুর পাচারের কারবারের নানা সুবিধের কথা ভেবেই এই সিন্ডিকেট তৈরি করেছে দালালেরা। আইনজীবী থেকে বি এস এফ সকলের সঙ্গেই তাদের যোগাযোগ। হাবড়া থানার মছলন্দপুর এলাকাই এই সিন্ডিকেটের মূল ডেরা। বনগাঁ মহকুমার গাইঘাটার আংরাইল, পোঁতাপাড়া, ঝাউডাঙা, পাঁচপোতা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রমরমিয়ে চলছে এই ব্যবসা। সীমান্ত পেরোতে দালালদের মাথা পিছু ১০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। বহু জায়গায় সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের বাড়িতেই আত্মীয় সাজিয়ে দিন কতক রাখা হয় বাংলাদেশীদের। সেজন্য বখরা পান গৃহকর্তা। বনগাঁর কলোনি থেকে বসিরহাটের ঘোজাডাঙা পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্ত প্রায় ৩২ কিলোমিটার। এরমধ্যে অধিকাংশই স্থল এলাকা। আসলে এখনও সীমান্তের বেশিরভাগ এলাকায় নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া। মূলত বনগাঁর কলোনি, স্বরূপনগরের তারালি, নগরকাঠি, হাকিমপুর, গাইঘাটার ঝাউডাঙ্গা, তারজালা, গোবরা সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় দিব্যি চলছে যাতায়াত ও গরুপাচার। উদাহরণ হিসেবে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে জেলার হরিদাসপুর সীমান্তে বি এস এফ-এর হাতে ধরা পড়েছিল এক নাইজেরিয়ান জঙ্গি। ২০০৮-এর মে মাসে বনগাঁ পেট্রোপোল সীমান্তে ধরা পড়েছে কয়েকজন জঙ্গি। ওই বছরেই ২১ মে পেট্রোপোলে শুল্ক দফতরের হাতে জাল পঞ্চাশটি ভিসা সহ ধরা পড়ে মনসুর রসিদ, জাহাদ হোসেন, জালালউদ্দিন, আবদুল্লা কওসব ও বাদসা মিঞা। ১৬ সেপ্টেম্বর পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে এদেশে ঢোকার পথে ধরা পড়ে রাকতিয়া হোসেন নামে এক আলকায়দা জঙ্গি সংগঠনের এক সদস্য। ধৃত এই জঙ্গি তালিবান শহরেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখত বলে গোয়েন্দাদের কাছে খবর রয়েছে। গত ডিসেম্বরে বনগাঁ শহর থেকে মহম্মদ তৈয়াব নামে এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

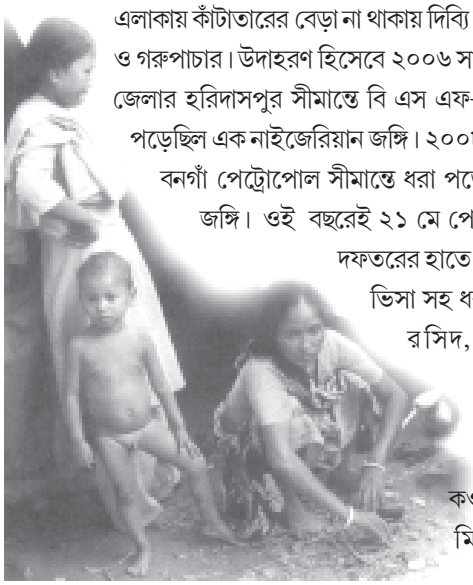

বাংলাদেশ থেকে লোকপাচার করার ব্যবস্থা বেশ চালু। এজন্য দালালেরা সবাই মিলে একটি সিন্ডিকেটও বানিয়েছে — যার নাম 'ধুর সিন্ডিকেট'। চোরাপথে যারাই দু'দেশের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে, তদের কোড চিহ্ন বহন করে এই শব্দটি। ধুর পাচারের কারবারের নানা সুবিধের কথা ভেবেই এই সিন্ডিকেট তৈরি করেছেদালালেরা।

বনগাঁতে আসা হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী নিত্য মিশে যাচ্ছে এদেশের মানুষের সঙ্গে। এদেশে আসার জন্য একটা নির্দেশনামা অবশ্য তাদের মানতে হয়। যেমন এপারে এসে বাংলাদেশীদের রাস্তাঘাটে যথাসম্ভব কম কথা বলতে বলা হয়। এদেশে ঢুকে মহিলাদের শাড়ির বদলে সালোয়ার কামিজ পরতে বলা হয়। লুঙ্গি ছেড়ে পুরুষদের বলা হয় শার্ট প্যান্ট পরতে। এদেশে ঢোকার পূর্বেই হিন্দু নাম নেওয়া হয়। তাই এদেশে একবার ঢুকে পড়লে শনাক্ত করা কঠিন হয়।

প্রথমে এরা সাধারণত যশোর রোডের ধারে বা কোনও গ্রামের পাশে একটু আশ্রয় সংগ্রহ করে নেয়। হিন্দু নামে প্রথম প্রথম পরিচিত হলেও রাজনৈতিক দাদাদের সহায়তায় ভোটার লিস্টে নাম তোলবার সময় সবাই মুসলমান নাম ব্যবহার করে। এভাবেই চলছে সীমান্তের গ্রামের চালচিত্র। নিত্য কমছে হিন্দুর সংখ্যা। বায়রা, বাগদা (ওপারে ঝিনাইদহ জেলা), হরিদাসপুর, জয়ন্তীপুর পিরাজপুর, কালিয়ানী, পাঁচপোতা (ওপারে যশোহর জেলা) গ্রাম হিন্দু শূন্য হচ্ছে। হিন্দু মেয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে।

রাখালদাসব্রীজ উদ্বোধন করতে এসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, বেকারদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করবেন, দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যবস্থা করবেন। সীমান্ত শহর বনগাঁবাসীরা ভেবেছিলেন এবার থেকে বেকারদের হাহাকার আর শোনা যাবে না। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে আই এস আই ও সিমি গরীব মুসলমান ঘরের ছেলেদের অর্থ দিয়ে জেহাদের জন্য সদস্য সংগ্রহ করছে। সদস্য সংগ্রহ করার পর তাদের পাঠানো হচ্ছে বাংলাদেশে। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা আবার ফিরে আসছে। পরিকল্পনা করছে ভারত বিরোধী নানা কাজের। এজন্য মসজিদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটলে গঠনমূলক কাজকর্ম ঠিকঠাক চলত। এককালে বনগাঁর চিরুণী শিল্পীর খ্যাতি ছিল ভারত জোড়া।

এখন বোম্বের চিরুণী তৈরির ডাস্ট (কেমিক্যাল) বাজার দখল করে নিয়েছে। দরিদ্র ব্যবসায়ীরা অভাবের তাড়নায় কেউ কেউ অন্যরকমও ভাবতে আরম্ভ করেছে।

বিয়ে করে ভোটার

যতীন সমাদ্দার

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের শাঁকচুড়োয় একটি ঘাটের নাম ছিল বেলাল মিঁয়ার। বেলাল বাংলাদেশী। সে ভারতে এসে বিয়ে করে। হাসনাবাদ থানার তালপুকুর গ্রামের এক দরিদ্র মেয়েকে। ওই বেলাল মিঁয়া একদিন ধরা পড়ে গোয়েন্দাদের হাতে। বসিরহাট সীমান্তে গ্রামের হিন্দুদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। বসিরহাট থানার এরকম একটি সীমান্ত গ্রামের নাম মুকুন্দকাঠি। এই গ্রামে হিন্দুর সংখ্যা ৫০০ এবং মুসলমান ১২০০ জন। গত দশ বছরে এলাকায় হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ শতাংশ এবং মুসলমান ২০ শতাংশ হারে। গ্রামের হিন্দু যাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তারা জমি-জায়গা বিক্রি করে অন্যত্র চলে গিয়েছে। সীমান্ত থানার অপর একটি গ্রামের নাম চৌরা। বসিরহাট থানার সীমান্ত এলাকার এই গ্রামটি বর্তমানে হিন্দুশূন্য গ্রাম। মুসলমান প্রধান গ্রামে পরিণতহওয়ায় এই গ্রামে অনুপ্রবেশকারীরা যাতায়াত করে এবং কেউ কেউ বসবাস করছে। তাদের নাম ভোটার তালিকায়ও রয়েছে। অনেকেই বেলাল মিঁয়ার মতো এলাকার মুসলমানদের মেয়ে বিয়ে করে ভোটার তালিকায় নাম তুলিয়েছে। নিন্দুকেরা বলেন, এখানকার মসজিদের ইমাম নিজেই একজন অনুপ্রবেশকারী — নাম জহরুল মোল্লা।

বসিরহাট থানার বিরামনগর গ্রামের কুরবান গাজী অনুপ্রবেশকারী হিসেবেই বসবাস করছেন। গ্রামেরই বালাত গাজীর মেয়েকে বিয়ে করেছেন। ভোটার তালিকায় নামও তুলিয়েছেন। শোনা যায় আজাহরউদ্দিন গাজীও গ্রামের হাজের গাজীর মেয়েকে বিয়ে করে বসবাস করছেন।

সুন্দরবনের নদীপথে বাংলাদেশ থেকে এসে নদীর চর দখল করে রয়েছেন অনেকে। তাতে স্থানীয় রাজনৈতিক দলও সহযোগিতা করছে। সন্দেশখালি থানার বের মজুর গ্রামের এরকমই এক অনুপ্রবেশকারীর নাম মোকতার। ইনি স্থানীয় সামসেদ মোল্লার মেয়েকে বিয়ে করে বিদ্যাধরী নদীর চর দখল করে বসবাস করছেন। এই গ্রামে তিনটি মাদ্রাসা ও ১টি মসজিদ রয়েছে। গত পাঁচ বছরে নতুন ২টি মাদ্রাসা হয়েছে।

সুন্দরবনই প্রবেশদ্বার ঢোলা গ্রাম নিরাপদ আশ্রয়

বরুণ শঙ্কর ঠাকুর

শিয়ালদহ সাউথ স্টেশন থেকে নামখানাগামী ট্রেন প্রায় দু'ঘন্টায় পৌঁছায় লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে। এই স্টেশন থেকে ২০ মিনিট বাসে চেপে পৌঁছে যাবেন 'ঢোলাহাট' বাজারে। এই ঢোলা হাট বাজার থেকে একটি রাস্তা পূর্বদিকে মিলনমোড় বাজারে এবং অন্য রাস্তা দক্ষিণ দিকে জুমাইলস্কর বাজারে চলে গেছে। ঢোলাহাট বাজারটি দক্ষিণ ২৪ পরগণার মুসলিম উপনিবেশের রাজধানী। এখানে আপনি ঐশ্লামিক দেশের সকল আচরণ ও বৈশিষ্ট্য অনুভব করতে পারবেন। প্রসঙ্গত ঢোলাহাট দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অনুপ্রবেশকারী জঙ্গি মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়। এই জেলায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের সুন্দরবনই নিরাপদ প্রবেশদ্বার। এই মুহূর্তে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কয়েকটি স্থান বেশি করে ব্যবহার করছে অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিরা। এলাকার গোসাবা অঞ্চলের অন্তত দুটি সীমান্ত আছে, যেখান দিয়ে অনুপ্রবেশ করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোসাবার আমতালি ও ধুচনিখালির একদিকে ভারত এবং অন্যদিকে বাংলাদেশ। মাঝখানে নদী। দুপারের মানুষ সহজে দুপারে যাতায়াত করতে পারে। আর এই সুবিধাটা জঙ্গিরা নেয়।

পাথর প্রতিমা এলাকার অম্বিকানগরের সোমবারের বাজার নামের জায়গাটিতে সপ্তাহে অন্তত একবার বাংলাদেশ থেকে পাঁচ ছয়টি বাংলাদেশী ট্রলার বেআইনীভাবে মাছ নিয়ে আসে। মাছের ট্রলার বলে এদের বিশেষ কেউ সন্দেহ করে না। কিন্তু অনেক সময়ই এইসব ট্রলার করে যতজন আসে তাদের মধ্যে সবাই ফিরে যায় না। এছাড়া সাগরদ্বীপ ঘুরে মাছ ধরার ট্রলার করে জঙ্গিরা এরাজ্যে আসছে বলে ধারণা গোয়েন্দাদের। তার জন্য সমুদ্রের মোহনায় যে নদীগুলি এসে মিশছে, সেই নদীগুলিই জঙ্গিরা ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ। তার জন্য অনেক সময় সাগরদ্বীপ বা মুড়িগঙ্গাকে যেমন ব্যবহার করা হচ্ছে, তেমনি ব্যবহার করা হচ্ছে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীকেও। কাকদ্বীপের গেঁয়োখালি, পাথরপ্রতিমার চিতুড়ি, জটাদেউল বা কুলতলির কুয়েমুড়ি, ডোমকল হয়ে জঙ্গিরা এদেশে অনুপ্রবেশ করে। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হুজি ও সিমির কার্যকলাপ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ক্রমবর্দ্ধমান। ২০০৭ সালের ২৩ জুন হুজির এক শীর্ষ নেতা জালালউদ্দিন মোল্লা ওরফে বাবুভাই উত্তরপ্রদেশের লখনউ-এর ওয়াজিরগঞ্জে ধরা পড়ে গোয়েন্দাদের পাতা জালে। বাবুভাই জয়নগরের বিলপাড়ার বাসিন্দা ছিল। জঙ্গিদের এরকমই এক নিরাপদ আশ্রয় হচ্ছে এই ঢোলাহাট থানা। যেখানে ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান জিতলে উৎসব পালন করা হয়। এলাকার হসপিটাল মোড়, ধলের মোড়, জুমাই লস্কর বাজার, চুনফুলি, শিমুল বেড়িয়া, বাইচচক্ প্রভৃতি স্থানে ইদ, মহরম, ঐশ্লামিক ধর্মসভার নামে হিন্দুদের কাজ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা হয়। কোনও হিন্দু যুবক ঢোলাহাট-এর উপর দিয়ে বিয়ে করতে গেলে তার গাড়ি থামিয়ে তোলা আদায় করা হয় নতুবা নববধূ সহ আটকে রাখা হয়। হিন্দু ব্যবসায়ীদের প্রতি মাসে তোলা দিয়ে ব্যবসার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হয়। এখানকার স্থানীয় স্কুলগুলিতে হিন্দু মেয়েদের ফুসলিয়ে বা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে মুসলিম ছেলেরা বিয়ে করে। ফলে অভিভাবকগণ স্কুলে মেয়েদের পাঠাতে ভয় পান। মুসলিমরা পরিকল্পনা মাফিক প্রধান রোডের ধার ধরে গ্রাম বসিয়েছে। ফলে হিন্দু গ্রামগুলি ভেতরে হয়ে যাওয়ায় মুসলিম গ্রাম-এর উপর দিয়ে হিন্দুরা যাতায়াত করতে বাধ্য হয়। হিন্দুরা প্রায়শই মুসলমান ডাকাতদের দ্বারা

ফঃ ৬

এলাকার গোসাবা অঞ্চলের অন্তত দুটি সীমান্ত আছে, যেখান দিয়ে অনুপ্রবেশ করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোসাবার আমতালি ও ধুচনিখালির একদিকে ভারত এবং অন্যদিকে বাংলাদেশ। মাঝখানে নদী। দুপারের মানুষ সহজে দুপারে যাতায়াত করতে পারে। আর এই সুবিধাটাই জঙ্গিরা নেয়।

লুণ্ঠিত হয়। রাস্তার ধারে বিভিন্ন সময়ে ধর্ষিতা মহিলা ও লুণ্ঠিত ব্যক্তির শবদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই সূর্যের আলো নিভলেই হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে বেরোতে সাহস পান না এবং ক্রমশ এই অঞ্চ ল থেকে পালিয়ে অন্যত্র বসতি স্থাপন করছেন। রাজনৈতিক নেতা পুলিশ প্রশাসন সবাই এখানে মুসলমানদের হাতের পুতুল। এই অঞ্চ লে হিন্দুদের উপর কীরকম চরম অত্যাচার চলে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

অলোক হালদার। পিতা বাদলচন্দ্র হালদার

গ্রাম ও পোস্ট - দুর্গানগর। থানা-ঢোলাহাট

অলোক হালদারের স্ত্রী শ্রীমতী বিনাপানি হালদার মীরে পাড়া গ্রামে এস এক কে শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা ছিলেন। গত ২০০৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার যখন তিনি বিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ওই গ্রামের মুসলমানরা তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। অলোকবাবু আইনের আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু স্ত্রী এখনও নিখোঁজ।

সুনীল হালদার। বাড়ি রামচন্দ্রনগর হসপিটাল মোড়

থানা-ঢোলাহাট

সুনীল হালদারের হসপিটাল মোড় বাজারে একটি মিষ্টির দোকান রয়েছে। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে তার ছোট মেয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী মামণিও বেচাকেনা করতো। কয়েক মাস আগে হঠাৎ মামণিকে জোড় করে তুলে নিয়ে যায় স্থানীয় বিবাহিত এক মুসলিম পুরুষ।

ভাগ্যধর সরদার। গ্রাম কাসারীচক্

থানা-ঢোলাহাট

ভাগ্যধর সরদারের বিধবা ভাই বৌ আবির সরদারকে একদিন স্থানীয় মুসলমান দুস্কৃতীরা তুলে নিয়ে যায়। ভাগ্যধর বহু চেষ্টা করে তাকে মুসলমানদের কবল থেকে উদ্ধার করে। এই ঘটনার বদলা নিতে ২০০৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে ভাগ্যধরকে বাড়ির সামনেই খুন করা হয় । পুলিশ প্রশাসন এই বিষয়ে এখনও নির্বিকার।

রামচন্দ্রনগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

পোস্ট রামচন্দ্রনগর। নেতাজী

অঞ্চ ল

থানা-ঢোলা

এই বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোর প্রচলন পরম্পরাগতভাবে চলে আসছিল। গত ২০০৬ সালে হঠাৎ স্থানীয় মুসলমানরা দাবি জানায় বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো হলে তাদের ধর্মীয় জলসা করতে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য এই বিদ্যালয়টি হিন্দু গ্রামে অবস্থিত এবং মুসলিম গ্রাম বিদ্যালয় হতে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে হওয়ায় হিন্দুরা এই দাবি মানতে পারেনি। হঠাৎ একদিন মুসলমানেরা আগ্নেয় অস্ত্র সজ্জিত হয়ে জোর করে বিদ্যালয়ের মাঠে জলসা শুরু করে। এই সময় পুলিশের তৎপরতায় ওই ধর্মসভা বন্ধ হলেও, মুসলমানরা বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দেয়।

বল কয়াল

গ্রাম-সাতের ঘেরী। শ্রীনারায়ণপুর পূর্ণচন্দ্রপুর অঞ্চ ল

থানা — ঢোলাহাট

প্রায় কয়েকবছর আগে বল কয়ালের মেয়েকে একদল মুসলিম দস্যু জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। ওই দস্যু দলের প্রত্যেক সদস্য মেয়েটিকে এমন অত্যাচার করে যে মেয়েটি শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

ঝন্টু বনিক

গ্রাম ও পোস্ট - বেনেপাড়া

থানা - ঢোলহাট

ঝন্টু বনিক প্রায় দশ বছর আগে ঢোলাহাটে কাপড় জামার ব্যবসা করতেন। স্থানীয় কয়েকজন মুসলিম দুস্কৃতী তার প্রায় লক্ষাধিক টাকার কাপড়ের মোট চুরি করতে এসে ধরা পড়ে যাওয়ায় ঝন্টু বাবুর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতি হয়। এই ঘটনার জেরে তাকে মেরে একদিন কবর দিয়ে দেয় মুসলিমরা। হত্যাকারীর এখনও শাস্তি হয়নি। ঢোলা ব্লকের মধ্যে ‘ধলের

মোড় সানকি বেড়ীয়া' নামে মুসলিম অধ্যুষিত একটি বাস স্টপেজ রয়েছে। সেখান দিয়ে আশপাশের গ্রামের হিন্দুদের যাতায়াত করতে হয়। প্রায় সময়ই মুসলমানরা বিভিন্ন অজুহাতে হিন্দুদের মারধোর করে এবং টাকা পয়সা কেড়ে নেয়। এই স্টপেজের সামনেই একটি মসজিদ রয়েছে। কোনও হিন্দু যদি বাড়ি তৈরি করার জন্য ইট বালি সিমেন্ট ওই মোড় দিয়ে নিয়ে যায়, তবে তাকে মসজিদের নামে কিছু মেটিরিয়াল দিতে বাধ্য করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা ও নোদাখালী থানার সীমান্তবর্তী এলাকা বুড়ুল। এখানে একটি মহাবিদ্যালয় ও বুড়ুল গ্রাম হাইস্কুল ও বুড়ুল হাইস্কুল নামে দুটি উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে। এই সকল স্কুল-কলেজে মুসলিম ছেলে-মেয়েদের একটি দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মুসলিম মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বের নামে সম্পর্ক গড়ে তুলছে এবং মুসলিম ছেলেদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে উৎসাহিত করছে। মুসলিম ছেলেরা লাল্টু, পল্টু, রাজু, বাবলু এরকম হিন্দু নাম নিয়ে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছে। এরই ফলস্বরূপ এলাকার প্রামাণিক পাড়ার শ্রীনাথ প্রামাণিকের মেয়ে সঙ্গীতাকে গত জুলাই কুতুবউদ্দীন নামে একটি মুসলিম ছেলে তুলে নিয়ে যায়। স্থানীয় প্রশাসনের এই ব্যাপারে কোনও হেলদোল না হওয়ায় দশ দিন পরে হিন্দু সংগঠনের চাপে পুলিশ প্রশাসন একটি মুসলিম বাড়ি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। একই অবস্থা দক্ষিণ ২৪ পরগণার সীমান্তের প্রত্যেকটি গ্রামের।

খোদ আগরতলাই বাংলাদেশীদের দৌরাত্ম্যের কবলে

প্রবীর কুমার চক্রবর্তী

বলতে গেলে পুরো ত্রিপুরা রাজ্যটাই সীমান্ত সংলগ্ন। তিন দিকে বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এখন জাল নোট, গরু পাচার, নারী পাচার, বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং মাদক পাচার ও জঙ্গি কার্যকলাপের নিরাপদ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদীদের কাছে ত্রিপুরা হল নিরাপদ আশ্রয়। কারণ মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের ব্যাপারে ত্রিপুরার শাসকদল, বিরোধী কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট সরকার উদাসীন।

বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভা ক্ষেত্রটি এখন বেআইনি অনুপ্রবেশ ও পাচার বাণিজ্যের নিরাপদ স্থান। কমলাসাগর বা কসবা বিখ্যাত বহু প্রাচীন কালী মন্দিরটির জন্য স্থানটি অনুপ্রবেশকারীদের 'উপযুক্ত' ক্ষেত্র। সীমান্ত প্রায় খোলামেলাই বলা যায়। দিনের বেলাতেই এপাড়-ওপাড় করা যায়, আর রাতে তো কথাই নেই। বি এস এফের বিরুদ্ধেও প্রচুর অভিযোগ রয়েছে।

কসবার সীমান্ত ঘেঁসে বাংলাদেশের রেল লাইন। এপাড় -ওপাড়ের মাফিয়ারা মিলে মিশে তাদের 'তৎপরতা' চালায়। এরা বি এস এফের একাংশের মদত পেয়ে থাকে। মদত রয়েছে রাজনৈতিক মহলের একটি অংশেরও। আর তাই বিশালগড় মহকুমার বহু স্থানে গাঁজার চাষ হয়ে থাকে। গাঁজার ব্যবসায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসনের একাংশের মদত। মাঝে মাঝে লোক দেখানো মাদক বিরোধী পুলিশ অভিযান হয়। তারপর আবার যে কে সেই।

প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে রাজ্যটি এখন সন্ত্রাসবাদী, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী, সীমান্ত মাফিয়া এবং চোরাচালানকারী ড্রাগ মাফিয়াদের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। খোদ আগরতলা শহর বাংলাদেশীদের দৌরাত্ম্যের কবলে। প্রতিদিন শত শত বাংলাদেশী এ শহরে ঢুকে পড়ছে জীবিকার সন্ধানে। এদের কেউ ঘরামি, রং মিস্ত্রী, কাঠ মিস্ত্রী, ঠিকা কাজের মেয়ে-ছেলে, কেউ বা রিক্সা চালক। ছোট ছোট বাংলাদেশী ছেলে-মেয়ে এই রাজ্যে ঢোকে তাদের মা বাবাদের সঙ্গে, তারপর নানা কাজে লেগে যায়। কেউ কেউ কাগজ কুড়ায়, কেউ পুরানো শিশি বোতল কুড়ায় বা কেনে, আবার কেউ ভাঙাচোরা জিনিস কুড়িয়ে বেড়ায়। আসলে এরা ছ্যাছড়া চোরের দল। আগরতলার মানুষ এদের 'হামলায়' ভীত। সন্ত্রাসবাদীরাও নাকি 'বিভিন্ন কাজে' এদের সাহায্য নেয়। অথচ পুলিশ ঘুমোচ্ছে।

'অত্যন্ত প্রগতিশীল' সি পি এম দল এবং এই দলের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার সন্ত্রাসবাদে পরোক্ষে মদত দিচ্ছে। মামুন মিঞার ঘটনা তার বড় প্রমাণ। তারা সব জেনে শুনেও সাহিদ মিঞা (চৌধুরী)কে ছেড়ে দিচ্ছে। আর বুক ফুলিয়ে রাজনীতি করে যাচ্ছেন সাহিদ চৌধুরী। এব্যাপারে কংগ্রেসও একই গোয়ালের গরু। প্রচুর মাফিয়া, চোরাচালানকারী ও মাদক পাচারকারীরা কংগ্রেসের ঘর জামাই। প্রাপ্ত সূত্র সংবাদে জানা গেছে সরকার দ্বারা পরিচালিত মুসলিম গেস্ট হাউস, ছাত্রাবাস প্রভৃতি মুসলিম মৌলবাদীরা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারছে। কারণ মুসলিম মৌলবাদীদের আলাদা করে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আগরতলা শহরের নিরাপত্তা যে কোনও সময় বিঘ্নিত হতে পারে।

রাজ্য পুলিশের মোবাইল টাস্ক ফোর্স এবং গোয়েন্দা শাখা যেন ব্যাটারিচালিত পুতুল। চাবি দিলে নড়ে চড়ে তারপর আবার

স্থির। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে এম টি এফ হঠাৎ অপারেশন চালায় এবং গুটিকতক অনুপ্রবেশকারীকে লোক দেখানো আটক করে। তারপর আবার প্রাণহীন দেহ হয়ে যায়।

সোনামুড়া এবং ত্রিপুরার অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের 'গ্রামীণ ফোন' এবং 'বাংলালিঙ্ক' দিব্যি ব্যবসা করে যাচ্ছে।

ত্রিপুরার কসবাতে অরক্ষিত সীমান্ত।

অথচ ভারতীয় মোবাইল পরিষেবা এই সব সীমান্ত এলাকায় অকার্যকর। বাংলাদেশীরা সেদেশের সিমকার্ড নিয়ে অনবরত ঢুকছে ত্রিপুরায়। রাজ্যের সোনামুড়া মহকুমায় বাংলাদেশী টাকা এবং সিমকার্ড ব্যবহার এখন সাধারণ বিষয়। গত বছর ২৬ অক্টোবর সোনামুড়া থানা এলাকার সাহাপুর সীমান্তে দুটি মোবাইল ফোন ও পাঁচটি সিমকার্ডসহ এক বাংলাদেশী মুসলিম যুবককে আটক করে বি এস এফ ১৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্তপুর বি ও পি-র জওয়ানরা। তার সঙ্গে বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশনের একটি পরিচয় পত্র পাওয়া যায়। বি এস এফ যুবকটিকে সোনামুড়া থানায় হস্তান্তর করলে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে যে তার দেওয়া তথ্য মিথ্যা।

ধৃত যুবকটি কেন এতগুলো সিমকার্ড নিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল তা জানায়নি পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা ডায়েরিতে অনেক নাম ও ফোন নাম্বার ছিল।

সোনামুড়া এবং বিশালগড় মহকুমার বিশাল সীমান্ত এলাকা দিয়ে জালনোটের ব্যবসা চালাচ্ছে আই এস আই মদতপুষ্ট এজেন্টরা। পুলিশ, বি এস এফ, কাস্টমস এবং সেন্ট্রাল আই বি-র কাছে এ ব্যাপারে প্রচুর তথ্য-প্রমাণাদিও রয়েছে। এই জাল নোট সমস্যা ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক শাখাতেও জাল নোট ধরা পড়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক এই জাল নোট চক্রের সঙ্গে রাজ্যের মাফিয়া চক্রের যোগ রয়েছে। রাজ্যে জাল নোট ছড়ানোর ব্যাপারে হুজি জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য মামুন মিঞা জড়িত থাকার ব্যাপারে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশ পেয়েছে বলেও জানা গেছে। মামুন মিঞার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার মধ্যে রাজ্যজুড়ে জালনোট ছড়ানো ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে রাজ্যে জাল নোট ছড়ানোর কাজে এক বিরাট চক্র সক্রিয়। মামুন মিঞা ছিল এই চক্রের একজন নেতা। পুলিশের কাছে মামুন জেরার সময় স্বীকার করেছে তার দায়-দায়িত্ব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। ত্রিপুরাকে সন্ত্রাসবাদ এবং আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের ঘাঁটি করার চেষ্টা রুখতে কেন্দ্রীয় সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

সীমান্তের সমস্যা ও আর এস এস

রমাপদ পাল

সীমান্ত শব্দটি ভারতবাসী বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে ভীতি ও সচেতনতার শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে— গত কয়েক দশকের ঘটনায়। প্রাচীন কাল থেকে আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে তথা মাতৃভূমির সীমাকে বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোকদ্বারা বন্দনা করে এসেছি তা হল— 'উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্ বর্ষং তৎ ভারতনাম ভারতী যত্র সন্ততি'। অর্থাৎ উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত যে ভূমি তা হল ভারতবর্ষ, আর এই ভূ-খন্ডে বসবাসকারীরা হল ভারতী। এই ভূখণ্ডকে গীতিকার বর্ণনা করেছিলেন — হিমালয় হতে কন্যাকুমারী গান্ধার হতে ব্রহ্মদেশ, সেই তো মোদের ধ্যানের ভারত সেই তো মোদের পূণ্যদেশ। পরবর্তীকালে মাতৃভূমির সেই সীমান্ত ছোট হয়ে এল। কবিগুরুর ভাষায় তা হল— "পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট ও মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ। তারপরও মাতৃভূমি আরও বিভাজিত হল। সীমা গেল ছোট হয়ে। পাঞ্জাব বাংলা দু'ভাগ হয়ে গেল, সিন্ধুও চলে গেল পাকিস্তানে। তারপরও ১৯৬১ সালে চীন আমাদের কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার দখল নিল। সেখানেও বদলে গেল সীমার প্রকৃতি। এইভাবে এক শতাব্দীতেই বিষ্ণুপুরাণের সেই মাতৃভূমির সীমানা সংকুচিত হতে হতে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তার উপর গত কয়েক দশকে অবশিষ্ট ভারত ভূমির উপর যে নিরন্তর আক্রমণ চলছে তার অনেকটাই সীমান্ত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। সেদিক থেকে সীমানা বা সীমান্ত অঞ্চল আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে নিত্য ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সীমান্তের সাধারণ মানুষ যখন অত্যাচার উৎপীড়নে ত্রস্ত, তখন কিন্তু অভ্যন্তরের নাগরিকরা নির্বিকার। যদিও এই ফাঁক তৈরির পিছনে এক বৃহৎ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে। যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিছু রাজনৈতিক নেতা ও তাদের দল এবং একশ্রেণীর প্রচার মাধ্যম করে চলেছে।

যে কোনও দেশেরই সুরক্ষা তথা নিরাপত্তার ব্যাপারে ভাবতে গেলে সীমান্ত অঞ্চলের কথা প্রথমেই ভাবতে হয়। প্রাচীনকালে রাজ-রাজাদেরও দেখা গেছে রাজধানীকে তারা যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি সীমান্ত অঞ্চলকেও তারা যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতেন। কেননা বহিঃশত্রুর আক্রমণ সাধারণত ঘটতো দেশের সীমান্ত অঞ্চল দিয়েই। আমাদের দেশেও বর্তমানে যে ধরনের নিরাপত্তাজনিত সঙ্কট রয়েছে তার মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলের সন্ত্রাস মুখ্য। কেননা

এই সন্ত্রাসে একদিকে দেশের সীমানাকে ক্রমশ ছোট করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যে ধরনের নাশকতামূলক কাজ চলছে তার পুরোটাই সীমান্ত অঞ্চলের দুর্বলতা, শিথিলতার কারণেই। যদিও আরও গভীরে গেলে দেশবাসীর মানসিকতাকেই মূলত দায়ী করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সেদিকে অবশ্যই কিছুটা দৃষ্টিপাত করবো, তবে বিষয় যেহেতু সীমান্ত অঞ্চলের সন্ত্রাস, তাই দৃষ্টি এদিকেই প্রথমে নিক্ষেপ করা যাক। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যা বা সন্ত্রাস কি? জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে তার প্রভাব কি? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দৈনন্দিন কার্যসূচীর মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যাকে কীভাবে দেখছে? সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাই বা এ ব্যাপারে কি করছে?

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ব্যানারে স্বয়ংসেবকরা উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবা কাজ করে চলেছে।

সঙ্ঘের দৃষ্টিকোণ

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখন সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় বালাসাহেবজী প্রতিবছরই বঙ্গপ্রান্তে প্রবাসে আসতেন। সঙ্ঘের কার্যবিস্তার ছাড়াও প্রকাশ্য সমাবেশগুলিতে তিনি জাতীয় জীবনের গৌরব এবং সঙ্কট নিয়ে যে বক্তব্য রাখতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যা, ধর্মান্তরকরণ ও অনুপ্রবেশ। একশ্রেণীর প্রচার মাধ্যম এবং বামপন্থী ও কংগ্রেসীরা সঙ্ঘের এই ধরনের বক্তব্যকে যেনতেন প্রকারে মুসলিম বিদ্বেষী তথা সাম্প্রদায়িক বলে প্রচার চালাতো। সঙ্ঘ দৈনন্দিন শাখার কাজেই লিপ্ত। বছরে এক-আধবারই এই ধরনের প্রকাশ্য সভা করে। ফলে সঙ্ঘ কখনই ওই ধরনের অপপ্রচারের পাল্টা কিছু করেনি। কিন্তু আজ যখন জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করতে বসা যায়, তখন কিন্তু সঙ্ঘের সেদিনের বক্তব্যকে অস্বীকার করার উপায় থাকে না, তা সে সীমান্তে সন্ত্রাসই হোক, অনুপ্রবেশই হোক বা ধর্মান্তরকরণ হোক।

সঙ্ঘের প্রয়াস

আজ থেকে ন'বছর আগে ২০০০ সালে সঙ্ঘ ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী রাষ্ট্র জাগরণ অভিযান চালিয়েছিল। তার মূল কর্মসূচী সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় স্তর থেকেই ঠিক হয়েছিল। সম্পূর্ণ কর্মসূচীই ছিল সাধারণের মধ্যে জাগরণ তথা সচেতনতা বৃদ্ধি। এজন্য সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা পরিকল্পনা করে মহকুমা, ব্লক, গ্রাম স্তর পর্যন্ত ছোট ছোট পুস্তিকা নিয়ে জনসম্পর্ক করেছেন। তাতে প্রাচীন ভারতের গৌরবের দিক যেমন তুলে ধরা হয়েছিল, তেমনি ভারতবর্ষের উপর আর্থ-সামাজিক আক্রমণের বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয়েছিল। তার সঙ্গেই ছিল সীমান্ত অঞ্চলের দুর্দশার কথা। এই পুস্তক দেশের সব রাজ্যের ভাষাগুলিতে ছাপা হয়েছিল। দেশ জুড়ে নীরবে চলা অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ কীভাবে সীমান্ত অঞ্চলকে মাধ্যম করে সঙ্কট সৃষ্টি করছে এবং তার পরিণাম কি হয়েছে ও হতে যাচ্ছে তাও উল্লেখিত ছিল।

তারপরও কেটে গেছে নয়টি বছর। এরমধ্যে আরও জটিল হয়েছে সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দেশের নানাস্থানে নাশকতামূলক কাজ। ক্রমসঙ্কুচিত হচ্ছে সীমানা।

সমস্যার স্বরূপ

গত কয়েক বছরে যদি আমরা বি এস এফ-এর বিভিন্ন আধিকারিকদের বিবৃতিগুলো একত্র করি, তাহলে বুঝতে পারবো সীমান্ত অঞ্চল আজ সম্পূর্ণ ভারতবাসীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। চোরাচালান, খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল, জাল নোট সরবরাহ, গো-হত্যা, গো-চুরি ও পাচার, কৃষিজ দ্রব্য চুরি, ডাকাতি, গবাদি পশু চুরি, নারীপাচার, শ্লীলতাহানি — কী নেই! অকল্পনীয় অত্যাচার ও উৎপীড়ন সীমান্ত অঞ্চলে ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে। যার ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে অলিখিতভাবে আজ

বনগাঁ, মালদা, দিনাজপুর, কোচবিহার, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। সীমান্ত সংলগ্ন অন্তত পক্ষে ১৫ কিলোমিটার এলাকা দুস্কৃতীকারীদের দখলে। যেখানে ভারতের এস ডি ও, বিডিও-দের সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা গুরুত্বহীন। ভোটলিপ্সু রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের ক্যাডাররা পার্টির স্বার্থের দিকে তাকিয়ে নগ্নভাবে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছে। তারা উপরিউক্ত সমস্ত ধরনের কার্যকলাপকে পরোক্ষ সমর্থন তো বটেই, বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থেও ব্যবহার করছে। অন্যদিকে দেশদ্রোহীরা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির এই দূর্বলতাকে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগাচ্ছে। পরিণাম সমগ্র দেশ আজ নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে।

সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর সঙ্গে অন্য দেশের সীমান্ত রক্ষীর গুলি বিনিময়ের মতো বড় ঘটনা সাধারণত সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আসে। কিন্তু যে সকল ঘটনা নীরবে সীমান্ত অঞ্চলকে ত্রস্ত করে তোলে তা কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে আসে না। কখনও ছোট-বড় কোনও ঘটনা প্রচার হলেও সেগুলির পরিণাম বা সেগুলির পিছনে থাকা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষ একেবারেই অন্ধকারে থাকেন। অথচ আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় ঘটনাগুলো খুবই সাধারণ। এই রকমই সব সাধারণ ঘটনা দিনের পর দিন ঘটতে ঘটতে আজ সীমানা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে নানাবিধ নাশকতামূলক তথা দেশবিরোধী কার্যকলাপ হবার পথও এর মাধ্যমে প্রশস্ত হচ্ছে।

প্রায়ই শোনা যায় সীমান্ত অঞ্চলে হিন্দু পরিবারগুলোর বাড়িতে রাতের অন্ধকারে ঢিল এসে পড়ছে, ঘটনা অত্যন্ত সাধারণ। এর বিচার থানা বা আদালতে হয় না, কিন্তু দিনের পর দিন এই ধরনের ঘটনায় জেরবার হিন্দু পরিবারগুলো বাধ্য হয়ে অন্যত্র পলায়ন করে বা উঠে আসতে বাধ্য হয়। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা ধীরে ধীরে জায়গা দখল নিচ্ছে। এভাবে বছর বছর চলতে চলতে দেখা গেছে এই ঢিল পড়া কিন্তু ক্রমশ এগিয়েই আসছে এবং হিন্দু পরিবারগুলোর বাড়িতেই হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগীদের এই সমস্যাকে বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ। কিন্তু জাতীয় জীবনে এর প্রভাব ও পরিণাম হচ্ছে ভয়ঙ্কর।

একই রকমভাবে বাড়ির গাছ-গাছালি উপড়ে ফেলা, তুলসী বা এই ধরনের গাছকে অপবিত্র করার জন্য গো-মাংস বা সেই ধরনের বস্তু দিয়ে উপদ্রব চালানো, রাতের অন্ধকারে হাঁস, মুরগী, ছাগল চুরি, পুকুরের মাছ চুরি, গাছের ফলচুরি, পুকুরে বিষ ঢেলে দেওয়ার মতো ঘটনা বেড়েই চলেছে। কিছুদিন আগে সংবাদ মাধ্যমেই প্রচার হয়েছিল যে হাবড়া মছলন্দপুরের গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলোতে বিষ প্রয়োগে গো-হত্যার ঘটনা। এগুলি সবই পরিকল্পিতভাবে নীরবে চালিয়ে যাওয়া সন্ত্রাস যা সীমান্ত অঞ্চলকে করে তুলেছে দুর্বিসহ।

এছাড়া মা-বোনেদের উপর অত্যাচার, ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া, নারী পাচারের মতো ঘটনাতো চলছেই। সব মিলিয়ে এক ব্যাপক পরিকল্পনা ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় হাসিল করার চেষ্টা চলছে।

স্বয়ংসেবকদের প্রয়াস

বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের হাতে চাল তুলে দিচ্ছেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী ও অন্যান্য স্বয়ংসেবকরা।

সঙ্ঘ দেশ ভক্ত নাগরিক নির্মাণের কাজ দৈনন্দিন শাখার মাধ্যমে করে চলছে বলে স্বাভাবিক ভাবেই এ ব্যাপারে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সচেতন। তাই এই সমস্ত রকম নীরব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সরব। সঙ্ঘের সামর্থ্য মতো স্বয়ংসেবকরা এই ধরনের উপদ্রগুলোর মোকাবিলা করেও আসছে। সুন্দরবন, হাসনাবাদ, বাগদা, গেদে, জঙ্গিপুর ইত্যাদি অঞ্চলগুলোতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বহুবারই সাধারণ মানুষকে নিয়ে মোকাবিলায় নেমেছে।

একবার উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া ও গন্ধর্বপুর অঞ্চলের

স্বয়ংসেবকরা দীর্ঘদিন ধরে চলা গো-পাচার রীতিমতো ভীতি প্রদর্শন করে বন্ধ করেছিল। তারপর বেশ কিছুদিন ওই অঞ্চ লে শাখার কাজ বেশ রমরমিয়ে চলায় পাচারকারীরা শঙ্কিত হয়ে ওই অঞ্চ ল ত্যাগ করেছিল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং-এর স্বয়ংসেবক দীনবন্ধু ঘরামি ২০০৪ সালে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে ওই জেলার বেশ কয়েকজন মা-বোনকে উদ্ধা র করেছিল। একই সঙ্গে ব্যাঙ্গালোর থেকে সুত্র বের করে মূল পান্ডা সহিলখান ও সুলতানা বেগমকে দলবলসহ গ্রেপ্তার করিয়েছিল।

২০০৫-এর আগস্ট নাগাদ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরে রিপোর্ট দিয়েছিল যে সুন্দরবন অঞ্চ লে মৎস্যজীবীদের মধ্যে আই এস আই নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। সেখানেও কোনও বাহ্যিক সহায়তা ছাড়াই স্বয়ংসেবকরা স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাধ্যমতো প্রতিকারের ভূমিকাও পালন করেছে।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সারা বছরে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে সীমান্ত অঞ্চ লে চোরা চালান, জালনোট বিস্তার, ভেজাল খাদ্য সরবরাহ, জাতীয় সম্পত্তি চুরি ইত্যাদি বিষয়ে জনজাগরণের কর্মসূচী গত প্রায় একদশক ধরে চালিয়ে আসছে।

“উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া ও গন্ধর্বপুর অঞ্চ লের স্বয়ংসেবকরা দীর্ঘদিন ধরে চলা গো-পাচার রীতিমতো ভীতি প্রদর্শন করে বন্ধ করেছিল। তারপর বেশ কিছুদিন ওই অঞ্চ লে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখার কাজ বেশ রমরমিয়ে চলায় পাচারকারীরা শঙ্কি ত হয়ে ওই অঞ্চল ত্যাগ করেছিল।”

আর্থ-সামাজিক ক্ষতি

সীমান্ত অঞ্চ লে আরও একটি নীরব সমস্যা যা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে দারুণ ক্ষতিকর তাহল সস্তার শ্রমিক আনা। অধিকাংশ ইঁটভাটা, কোলস্টোরেজের মালিক, পাইকারি ব্যবসাদাররা সস্তায় বাংলাদেশী মুসলিম মহিলা ও পুরুষদের শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগায়। ওদের সারাদিনের কাজ এপারে অথচ থাকছে ওপারে। এভাবে ধীরে ধীরে এরা সম্মিলিত ভাবে ঘাঁটি গেড়ে এপারকেই বাংলাদেশ বানিয়ে তোলে। তাতে একদিকে যেমন এদেশের গরীবরা কাজ পাচ্ছে না, অন্যদিকে বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে অর্থ ওপারে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ তো আবার এই ধরনের শ্রমিকদের মজুরি বাংলাদেশী টাকাতে দেয়। এই ধরনের মহিলা শ্রমিকরা আবার ধীরে ধীরে রেশন কার্ড, ভোটার তালিকায় নাম তোলার মতো কাজ সেরে তো ফেলেই, তার উপর গর্ভবতী মহিলারা স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান প্রসব করে অনায়াসেই বার্থ সার্টিফিকেট বের করে নিচ্ছে। এইভাবেও সীমান্ত অঞ্চ লে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের প্রভাব বেড়ে চলেছে এবং তা সরকারি নথিতে স্বীকৃত বলে গণ্য হচ্ছে।

এইভাবে দেশের সীমান্ত অঞ্চ লে কার্যকলাপের ফলে দারুণ আর্থ সামাজিক ক্ষতি হচ্ছে। অথচ ভিতরের দিকের নাগরিকদের এ ব্যাপারে কোনও মাথা ব্যাথাই নেই। তার কারণ দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো এই ধরনের ক্ষতিগুলোকে তুলে ধরে জনজাগরণ ঘটাতে ব্যর্থ। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় স্বার্থে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে বাজিমাত করতে তারা একদিকে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড করে দিচ্ছে, অন্যদিকে যে সকল স্বয়ংসেবক এই ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। প্রচার মাধ্যমের একাংশ এই বিষয়গুলোকে ঘুরিয়ে সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু নির্যাতন, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয় তুলে জাতীয়তাবাদী মানুষদেরকেই সমাজের কাছে দোষী হিসাবে সাব্যস্ত করছে।

এতৎসত্বেও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা কাজ করে চলেছে। সীমান্ত অঞ্চ লের স্বার্থ রক্ষায় সদাই তৎপর। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি উল্লেখ না করলেই নয় তাহল বালুরঘাটের স্বয়ংসেবক চুরকা মুর্মুর আত্মত্যাগ। ঘটনা অনেকেরই জানা। ১৯৭১-এ বালক চুরকা সকাল বেলায় দেখতে পায় ক্যানেলের ওপারে গাছ নড়ছে। কিছুক্ষণ আড়াল থেকে দেখেই বিষয়টি সে অনুমান করে দৌড়ে এসে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে খবর দেয় এবং তাদের তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসার জন্য চাপ দিতে থাকে। প্রথমদিকে কয়েকজন রক্ষী এগোতে সাহস না পেলেও চুরকার চাপে এগোতে থাকে। শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ। আক্রমণকারী খান সেনারা বুঝতে পারে চুরকার কাজ। তারা গুলি চালিয়ে হত্যা করে তাকে। আজও নির্দিষ্ট দিনে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বীর চুরকাকে স্মরণ করে। চুরকার এই ত্যাগ ও তৎপরতা দৈনন্দিন শাখার সংস্কারের ফলে জাগরিত হয়েছিল। সঙ্ঘের দৈনিক শাখায় এই রকম চুরকা তৈরির কাজ নিরন্তর হয় যা শুধু সীমান্ত অঞ্চ লই নয়, সমগ্র দেশের তথা দেশবাসীর স্বার্থের কাছে আশাব্যঞ্জক

সীমান্ত অঞ্চ লের সমস্যা সম্পর্কে বলতে গেলে যে আরও একটি বিষয়ের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে তা হল, ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে এই প্রবাদ বাক্যটি। অর্থাৎ সীমান্তের সাধারণ মানুষ যখন অত্যাচার উৎপীড়নে ত্রস্ত, তখন কিন্তু অভ্যন্তরের নাগরিকরা নির্বিকার। যদিও এই ফাঁক তৈরির পিছনে এক বৃহৎ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে। যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিছু রাজনৈতিক নেতা ও তাদের দল এবং একশ্রেণীর প্রচার মাধ্যম করে চলেছে। গত এক দশকের হিসাব নিলে দেখা যাবে কোচবিহার, দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার সীমান্ত অঞ্চ ল থেকে সাধারণ মানুষ নীরবে কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চ লে চলে আসছে। উল্টোদিকে অনুপ্রবেশকারীরা ধীরে ধীরে জমি যেমন দখল নিয়েছে, তেমন তেমন হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যাগত ভারসাম্যের

“একদিন যারা অত্যাচারিত, উৎপীড়িত হয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে, আজ তারাই ওই সাময়িক চাওয়া-পাওয়া, ফাটকা অহমিকায় প্রবৃত্ত হয়ে আরও একবার দেশবিভাগের মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ হল দেশের সীমানা আজ ধীরে ধীরে সরকারিভাবে না হলেও কার্যত ছোট হচ্ছে। সেখানে বিজাতীয় ভাবধারা ও কার্যকলাপ অবাধে হচ্ছে।”

পরিবর্তনও প্রকট হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে বি এস এফের বিভিন্ন অফিসারদের বিবৃতি, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট এই আশঙ্কা সবদিক থেকে প্রমাণ করেছে। তাই তথ্যসহ তুলে ধরে জায়গা ভরাট করার বোধ হয় প্রয়োজন নেই।

গত কয়েক দশকে ঘটে চলা এই নীরব আক্রমণের পরিণামও ঘটে চলেছে। সীমান্ত অঞ্চ লের বহু ঘটনার সিদ্ধান্ত স্থানীয় প্রশাসক, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদেরকে এমনভাবেই নিতে হয় যা কয়েকটি রাজনৈতিক দলের ভোট রাজনীতির স্বার্থ পুষ্ট। এক্ষেত্রে যে কথাটি আরও স্পষ্ট করে বলা যায় তাহল, ওই অনুপ্রবেশকারীদের ইচ্ছাকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মান্যতা দিতে হয়। সেক্ষেত্রে সীমান্ত অঞ্চ লের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থ তিল তিল করে ওই রাজনৈতিক দলগুলির ভোট রাজনীতির স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে ক্ষুণ্ণ করতে হচ্ছে। সঙ্ঘ ছাড়া অন্য যারাই এই ধবংসাত্মক ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে সরব হয় তাদেরকেই সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক অত্যাচারের শিকার হতে হয়। এদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চ লগুলোতে বসবাস করেন ওপার বাংলা থেকে অত্যাচারিত উৎখাত হিন্দুরা। লক্ষণীয় বিষয় হল, যে কারণে তারা তাদের জন্মভূমি ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন, আজ তারাই রাজনৈতিক দলের ক্যাডার হয়ে পরোক্ষে ওই উৎখাত ও অত্যাচারিত হওয়ার অবস্থাকেই পুষ্ট করছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কিন্তু শুধু সীমান্ত অঞ্চ লেই নয়, সারা দেশেই এই ধরনের আত্মঘাতী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সচেতনতা জাগরণের কাজ নীরবে করে চলেছে। সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেবজী বহুবার বাংলার এই দুর্দশার বিরুদ্ধে আটের দশকে বিভিন্নভাবে বক্তব্য রেখেছেন। সেদিন অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ জাতীয় জীবনের কাছে বিভীষিকা বলে বালাসাহেবজী যে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন আজ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। সঙ্ঘ দেশজুড়ে এই ধরনের বিপদের ব্যাপারে সচেতনতা জাগরণের কাজ করে চলেছে। গত ২০০০ সালে সঙ্ঘের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সঙ্ঘ দেশজুড়ে যে রাষ্ট্র জাগরণ অভিযান চালিয়েছিল তার মধ্যে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবময় দিক যেমন ছিল, তেমনি রাষ্ট্রের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা জাগানোর জন্য লক্ষ লক্ষ পুস্তিকার মাধ্যমে স্বয়ংসেবকরা গ্রামে গ্রামে পৌঁছেছিল। একইসঙ্গে সীমান্ত অঞ্চ লের সন্ত্রাস ও তার পরিণাম সম্পর্কেও

অবহিত করার প্রয়াস চালিয়েছিল। আজ সেই আশঙ্কাই কতটা যে বাস্তব তা আজ সকলেরই জানা। সঙ্ঘের শাখার মাঠে স্বয়ংসেবকরা দৃঢ় চিত্তে আশার আলো জ্বালিয়ে গান গায় — 'পশ্চিমে গান্ধার ভারতের অঙ্গ ব্রহ্মদেশ পূবে, অখন্ড ভারতের সকলের সাথে আমাদের হবে জয় হবে জয়।'

একটি মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করে বিষয়টির ইতি টানবো। ঘটনাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে সীমান্ত সমস্যা বা অনুপ্রবেশ সমস্যার আসল ঘাটতির দিক।

ঘটনাটি ২০০১ সালের। খালেদা জিয়া সরকার বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আসীন হবার পর বাংলাদেশে শুরু হল সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ব্যাপকহারে অত্যাচার উৎপীড়ন। কাতারে কাতারে হিন্দুরা সহায় সম্বল হীন হয়ে এবঙ্গে পালিয়ে আসতে লাগলো প্রাণটুকু সম্বল করে। বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির নামে স্বয়ংসেবকরা ত্রাণ ও সেবা কার্য শুরু করলো। এই সেবাকার্যের জন্য সঙ্ঘের আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে যুবকরা ১৫ দিন বা একমাসের জন্য সেবাব্রতী বা সঙ্ঘের বিস্তারক হিসাবে ঘরবাড়ি ছেড়ে শিবিরে যোগ দিল। অন্যদিকে সারাদেশ থেকে স্বয়ংসেবকরা ত্রাণ ও সেবাকার্যের জন্য অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে পাঠাতে লাগলো। শুরু হল উদ্বাস্তুদের খাদ্য ও বস্তু সামগ্রী দিয়ে সেবার পালা। ধীরে ধীরে উদ্বাস্তু হিন্দু ভাই-বোনেরা কষ্ট করে বাংলার জনজীবনে মিলে গেল। দারিদ্র্যের সঙ্গে তারা জীবন নির্বাহ করতে লাগলো। কয়েকমাস পর এই সেবাকাজে বিস্তারক থাকা এক যুবক বনগাঁয় কোনও কাজে গেল। বনগাঁ কলেজে গিয়ে এক উদ্বাস্তু হিন্দু যুবকের সঙ্গে দেখা হল। সে কলেজে পড়ে না কিন্তু কলেজ চত্বরেই বেশিরভাগ সময় কাটায়। পূর্ব পরিচিত হবার সুবাদে বিস্তারক থাকা ওই যুবক সেই উদ্বাস্তু হিন্দু যুবকের সঙ্গে উপযাচক হয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলো। কথা প্রসঙ্গে বিস্তারক যুবকের মুখ দিয়ে ভারতমাতা, বন্দেমাতরম্ শব্দ দুটি বেরিয়ে আসায় উদ্বাস্তু হিন্দু যুবকটি তাঁকে বেধড়ক মেরে মুখ দিয়ে রক্ত বের করে দিল। সেই সঙ্গে তাঁকে শাসিয়ে যা বলেছিল তা মর্মান্তিক। সে বলেছিল "এয়ানে ওসব চলবো না, মাইর‍্যা ফাটায়া ফালামু"। সত্যি কথা বলতে কী, এইখানেই লুকিয়ে আছে শুধু সীমান্তের সমস্যাই নয়, দেশজুড়ে যাবতীয় বিজাতীয় কান্ডের রহস্য। যে বা যার জন্য এতকিছু আত্মত্যাগ সে বা তারাই কালের গতিতে উপকারী সহকারী মিত্রকে নির্দ্বিধায় শত্রু করে দিচ্ছে। আসলে আজকের পরিস্থিতিতে সস্তার জীবনযাত্রা, সাময়িক চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদির প্রকোপে নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থ চরমভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তথাপি এক অদ্ভুত ঘোরে মানুষ আবদ্ধ। এইখানেই রয়েছে আসল সমস্যা। যার কারণে আজ দেশি তো কাল বিদেশী। শরীর দেশি তো মন বিদেশী। এমনকী দেশও হয়ে যাচ্ছে বিদেশ। সীমান্ত সেখানে হয়ে যাচ্ছে ঠুনকো। তাই বিষ্ণুপুরাণের প্রকৃত সীমা আজ ছোট হতে হতে কতটুকু হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আর ভাববার অবকাশই নেই দেশবাসীর।

সীমা পাড়ের বা সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যা শুধু সীমান্তেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ভারতবর্ষের গত কয়েক দশকের ইতিহাস সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হিন্দুদের মনে উদাসীনতা, স্বধর্ম সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য তথা ভালোবাসার ভাব যেখানে ফিকে হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। ভারত বিদ্বেষের এই চাতুরিপূর্ণ আক্রমণ বা কৌশলকে আজ সীমান্তের সন্ত্রাস বা সমস্যা বলে অভিহিত করতে হচ্ছে। একদিন যারা অত্যাচারিত, উৎপীড়িত হয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে, আজ তারাই ওই সাময়িক চাওয়া-পাওয়া, ফাটকা অহমিকায় প্রবৃত্ত হয়ে আরও একবার দেশবিভাগের মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ হল দেশের সীমানা আজ ধীরে ধীরে সরকারিভাবে না হলেও কার্যত ছোট হচ্ছে। সেখানে বিজাতীয় ভাবধারা ও কার্যকলাপ অবাধে হচ্ছে। বিতাড়িত হবার আগে যে ধরনের সমস্যায় তাদের ভুগতে হয়েছিল সেগুলিকেই ভুগতে হচ্ছে — সীমান্ত থেকে একশো দেড়শো কিলোমিটার ভিতরে থেকেও। সব জেনে বুঝেও তিল তিল করে জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেও এই বিপদকেই স্বাগত জানাতে হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত। সঙ্ঘ তাই ব্যক্তিচরিত্র ও রাষ্ট্রচরিত্রের মধ্যে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাব নির্মাণই দৈনিক শাখার মাধ্যমে করে চলেছে। যা পরিণামে সমাজ তথা রাষ্ট্রজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রতিফলনে সক্ষম হয়। এভাবেই সঙ্ঘ সীমান্ত সমস্যার নিরসনে নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছে।

Swastika 13 April 2009 (Nababarsha Spl.)
Rs. 6.00 ● RNI No. 5257/57

Postal Regd. No. SSRM/Kol.RMS/W.B./RNP-048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L. No. MM & P.O. - SSRM-Kol.RMS/RNP-048/LPWP-021/2007-09

দাম ঃ ছয় টাকা